Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের ছোটগল্প

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.9
Pages	191-225
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের ছোটগল্প

বিশ্বজিৎ ঘোষ

রেনেসাঁস-উত্তরকালে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার পরম বিকাশের যুগে, আধুনিক মানুষের জীবনে দেখা দেয় বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য এবং সীমাহীন জটিলতা। আধুনিক মানবচৈতন্যের সমুদ্রবিস্তৃতি ও বিভঙ্গতা, বহুভুজ বিসঙ্গতি ও বিপর্যয়, অন্তর্গূঢ় বেদনা ও উজ্জ্বল আশাবাদ— এইসব প্রবণতা প্রকাশের অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিল্প-আঙ্গিকরূপে ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ। পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্যন্তর সীমাবদ্ধতার চাপে, সময়ের শাসনে মানুষ যতই যান্ত্রিক হয়েছে, ছোটগল্প-সাহিত্যের বিকাশ ততই হয়েছে ঋদ্ধ। পূর্ণ জীবন নয়, বরং বৈরী পৃথিবীতে জীবনের খণ্ডাংশই মানুষের কাছে প্রাধান্য পেল। এ-অবস্থায় উপন্যাসের পরিবর্তে ছোটগল্প উঠে আসলো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কেননা, একক অনুষঙ্গের আধারেই ছোটগল্পে ফুটে উঠলো পূর্ণ জীবনের ব্যঞ্জনা—পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সম্পূর্ণ সূর্য।

উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেরও আদি উৎসভূমি ইয়োরোপ। ইয়োরোপীয় সমাজে প্রবহমান রূপকথা, লোকগাঁথা বা রোম্যান্সকাহিনী— যা ছিল মানুষের মনোরঞ্জনের অন্যতম মাধ্যম—ইতালীয় রেনেসাঁসের পর রূপান্তরিত হয় নতুন চেতনায়, নব-প্রতিনব জিজ্ঞাসায়। বোক্কাচ্চিও, চসার, র‍্যাঁবলে, সারভান্টেসের সামূহিক সাধনায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো ছোটগল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কাহিনী-চরিত্র-প্লট আর সাবলীল সংলাপরীতি।[১] বস্তুত, এঁরাই আধুনিক ছোটগল্পের প্রত্ন-উৎসের জনয়িতা; এঁদের সাধনার সরণি ধরেই উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমে আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের প্রধান ছোটগাল্পিকরা।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্স-রাশিয়া-ইংল্যান্ড-আমেরিকায় ছোটগল্পের যে শিল্পিত বিকাশ ঘটেছে, তার প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, ভারতবর্ষেও। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সংঘটিত হয়েছিল সীমাবদ্ধ নবজাগরণ। নবজাগরণের ফলে শিল্প-সাহিত্য-ধর্মচর্চা—সর্বত্র একটা বিপুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নতুন নতুন শিল্প-আঙ্গিকে পূর্ণ হতে থাকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকেই নাটক-প্রহসন-মহাকাব্য-গীতিকবিতা-উপন্যাস রচিত হলেও ছোটগল্পের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছিল শতাব্দীর শেষ দশক অবধি। উনিশ শতকের নব্বুইয়ের দশকেই, যথার্থ অর্থে, বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু, এবং বলাইবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) হচ্ছেন সে-যাত্রার পথিকৃৎ।

২.

কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ঘটে উনিশ শতকের প্রারম্ভে, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত এই মধ্যশ্রেণীর সাধনাতেই সূচিত হয় বাংলা ছোটগল্পের সমুদ্রসম্ভব বর্ণিল-যাত্রা। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে শতবর্ষ বিলম্বিত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশে রাখে ঐতিহাসিক অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ নব্য-শিক্ষিতের সমবায়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ক্রমবিকশিত হচ্ছিলো ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্য-বিত্তশ্রেণী। পূর্ববাংলার নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেতনাস্নাত কয়েকজন শিল্পীর সাধনায় রচিত হয়েছে বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের প্রাথমিক ভিত্তি।

ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী মর্মমূলে সামন্ত-মূল্যবোধ ধারণ করেও বুর্জোয়া সমাজসংগঠনের চিন্তা-চেতনা, উদার মানবতাবোধ এবং যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে গঠন করলো 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। অপরদিকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী লেখক ও শিল্পীরা গঠন করলো 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৩৯)। এই দুই সংগঠনের শিল্পীদের মানসভূমিতে পূর্ববঙ্গ উপ্ত করেছে স্বাতন্ত্র্যের বীজ; এবং এঁরাই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববাংলার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জীবনচেতনায় অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে পূর্ববঙ্গের ছোটগাল্পিক-চেতনাপুঞ্জ প্রবাহিত হয়েছে দুটি ভিন্ন স্রোতে। একটি স্রোতের উৎসে ছিলেন সামন্ত-মূল্যবোধে বিশ্বাসী গল্পকাররা; অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী কথাকোবিদদের সাধনায়। প্রথম স্রোতটি নির্মাণ করেছেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৬), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৮-১৯৭৯) প্রমুখ; আর দ্বিতীয়টি আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-), আবু রুশদ

(১৯১৯-), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), শওকত ওসমান (১৯১৭-), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-) প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অসম সমাজবিকাশের কারণে বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসলোকে বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল এবং সত্যস্পর্শী।[২]

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন কিংবা বন্দে আলী মিয়ার গল্প শিল্পমূল্যে সমৃদ্ধ নয়, কিন্তু পূর্ববাংলার গল্পসাহিত্যের বিকাশ ধারায় তাঁদের প্রয়াস ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের গল্পে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের ধর্মাশ্রিত সংস্কারস্নিগ্ধ প্রথাচল জীবনপ্রত্যয় রূপায়িত হয়েছে সরল প্লটের আশ্রয়ে, সাবলীল ভাষায়। সামন্ত-মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আসক্তি এবং উনিশ শতকী জীবনধারণা তাঁদের গল্পসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'ধানের মঞ্জরী (১৯৩২), 'শিরণী' (১৯৩৩), 'পয়লা জুলাই' (১৯৩৪), 'শিরোপা' (১৯৩৭); এবং বন্দে আলী মিয়ার 'মেঘকুমারী' (১৯৩৬), 'মৃগপরী' (১৯৩৭), 'হরিণ' (১৯৩৯), 'অরণ্যের বিভীষিকা' (১৯৪৫) প্রভৃতি ছোটগল্প-সঙ্কলনের নাম।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বেই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আবুল ফজলের দীপ্র আর্বিভাব। যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়, কল্লোলীয় ভাবোচ্ছ্বাস ও মনোবিশ্লেষণ, এবং মুসলিমসমাজের সংস্কারাচ্ছন্নতা-স্বপ্নচারিতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আবুল ফজলের গল্পজগৎ। 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র সাহিত্য-ধারায় যে নাগরিক চেতনার উদ্বোধন, মুসলিম কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আবুল ফজলের রচনাতেই তার প্রথম উদ্ভাসন। প্রগতিশীল সমাজচেতনা, মুসলিম মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতা এবং অসাম্প্রদায়িক জীবন-চেতনা আবুল ফজলের শিল্পিমানসের মৌল বৈশিষ্ট্য, এবং স্বাভাবিক ভাবেই এ-সব প্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে। মনোগহনের জটিলতা উন্মোচনে আবুল ফজল উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে লেখা ''মৃতের আত্মহত্যা'', ''নিহত ঘুম'', ''ইতিহাসের কণ্ঠস্বর'', ''কান্না'' প্রভৃতি গল্প আবুল ফজলের প্রগতিশীল সমাজভাবনা ও ইতিহাসবোধের পরিচয়বাহী। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সৈনিক আবুল ফজলের ছোটগল্পে উদার মানবতাবাদীচেতনা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিশীলিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের

সাংগঠনিক-পরিচর্যায় আবুল ফজল তেমন মনোযোগী নন। ছোটগাল্পিক সংহতির অভাবে তাঁর অনেক গল্পই অর্জন করতে পারেনি শৈল্পিক সিদ্ধি।

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক গল্প রচনায় আবুল মনসুর আহমদের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সমাজের নানা দোষ-ত্রুটি ও অসঙ্গতি তিনি ব্যঙ্গের আবরণে উন্মোচন করেন। ভণ্ডধার্মিক, অসৎ রাজনীতিবিদ এবং কপট সমাজসেবকের বহুমাত্রিক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি আবুল মনসুর আহমদের ছোটগল্পে।[৩] সাবলীল ভাষা, চরিত্রানুগ সংলাপ এবং সরল প্লট আবুল মনসুর আহমদের গল্পের জনপ্রিয়তার মূল কারণ। 'আয়না' (১৯৩৫), 'ফুড কনফারেন্স' (১৯৫০) প্রভৃতি গ্রন্থে আবুল মনসুর আহমদ সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে প্রত্যাশা করেছেন মানবিক অন্তঃসঙ্গতির উদ্বোধন।

মুসলিম মধ্যবিত্তের সংস্কারচেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা, এবং দেশবিভাগের আবেগ-উচ্ছ্বাস-উদ্বেগে সিক্ত আবু রুশদের গল্পভুবন। দেশবিভাগের পূর্ববর্তী-পরবর্তী সামাজিক সঙ্কট নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনায় তিনি অতি-উৎসাহী, কিন্তু সে-উৎসাহ ইতিহাসচেতনা ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতার অভাবে প্রায়ই মানবরসে হতে পারেনি জারিত। মধ্য-বিত্তজীবনের নানা অসঙ্গতি ও অন্তঃসারশূন্যতা আবু রুশদের প্রিয় বিষয়। 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' (১৯৬৩) এবং 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' (১৯৭৪) গল্পগ্রন্থে নাগরিক মধ্যবিত্তের চিত্তপ্রবঞ্চনা অসঙ্গতি এবং অনন্বয় শিল্পিত ভাষ্যে রূপলাভ করেছে। বিভাগ-পূর্বকালে রচিত 'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থে রোম্যান্টিক জীবনচেতনার যে প্রকাশ ঘটেছিল, পরবর্তীকালের গল্পে সে-জগৎ ছেড়ে আবু রুশদ মুসলিম মধ্যবিত্তের বাস্তবজীবনে করেছেন বিচরণ। ছোটগাল্পিক সংহতি এবং নাট্যিক ব্যঞ্জনায় আবু রুশদের গল্প বিশিষ্ট।

দক্ষিণ বাংলার গরীব-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পসাহিত্য। যুদ্ধোত্তর-পটে মানুষের অন্তহীন দুর্ভোগ-নির্বেদের গল্পরূপ-সৃজনেও তিনি রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ''পথ জানা নাই'', ''দুই হৃদয়ের ঢেউ'', ''অনেক দিনের আশা'', ''রক্তের স্বাদ'' প্রভৃতি গল্প তাঁর প্রখর সমাজবোধের পরিচায়ক। ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা ''রক্তের স্বাদ'' গল্প একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। বাংলা কথাসাহিত্যে দাঙ্গার পটে লেখা গল্প-

উপন্যাসের মধ্যে ''রক্তের স্বাদ'' দাবি করতে পারে বিশিষ্টতা। বরিশালের উপভাষা শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে অর্জন করেছে শিল্পিত লাবণ্য। তাঁর অধিকাংশ গল্পে উপভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা।

সোমেন চন্দের গল্প বাংলা ছোট গল্পের ধারায় সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। বাংলা সাহিত্যে সমাজবাদী চিন্তার শিল্পরূপ নির্মাণে তিনি পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। নিরন্ন খেটে-খাওয়া মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পে। সোমেন চন্দের গল্পে মানুষের মুক্তিকামনা উচ্চারিত হয়েছে, ধ্বনিত হয়েছে মানবাত্মার বিজয়গাঁথা। রাজনীতি-সচেতনতায় এবং সমাজকাঠামো পরিবর্তনের বাসনায় সোমেনের গল্প বিশিষ্ট ও ব্যক্তিক্রমধর্মচিহ্নিত। এ-প্রসঙ্গে তাঁর "বনস্মৃতি", ''একটি রাত", "ইঁদুর", "সঙ্কেত" প্রভৃতি গল্প স্মরণ করা যায়।

উপন্যাসের মতো, ছোটগল্পেও, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্য একক অনতিক্রান্ত এবং প্রাতিস্বিকতাচিহ্নিত। শিল্পবোধ ও জীবনচেতনার প্রশ্নে পূর্বাপর সতর্ক, সপ্রতিভ এবং বিশ্ববিস্তারী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পসমূহ বাংলা সাহিত্যের ধারায় সংযোজন করেছে এক স্বকীয় মাত্রা। যুদ্ধোত্তর বিনাশী প্রতিবেশে বাস করেও মানবীয় অস্তিত্বের ক্লান্তিহীন সাধনায় তিনি ছিলেন স্থিতপ্রাজ্ঞ। নিরস্তিত্বের শূন্যতায় ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নয়, অন্ধকার ভেঙ্গে ভেঙ্গে অস্তিত্বের দায়িত্বশীল স্বাধীন সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর ছোটগল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য। গল্পের বিষয় নির্বাচনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন বাংলাদেশের জনজীবনসম্পৃক্ত, কিন্তু বক্তব্য ও প্রকরণে সর্বজনীন, বিশ্বপ্রসারিত, স্বনিষ্ঠ এবং পরীক্ষাপ্রিয়। 'চেতনা ও আঙ্গিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পসমূহ যেন তাঁর পরিব্যাপ্যমান জীবনবোধের অনুবিশ্ব। মানুষের অস্তিত্ব-অভীপ্সা, নৈঃসঙ্গ্য, ভয়-অনুশোচনা প্রভৃতি তাঁর গল্পের উপজীব্য।'[৪]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধিকাংশ গল্পই মনস্তত্ত্বধর্মী ও মনোময়। সমাজের বর্হিবাস্তবতার চেয়ে মানবজীবনের অন্তর্বাস্তবতার জগতে বিচরণ করতে তিনি অধিক উৎসাহী। তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের অন্তর্জীবনের ইতিকথা, হার্দিক অগ্ন্যুৎপাত। বাংলাদেশের গ্রামীণজীবন

ডিটেইল্ নিয়ে তাঁর সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে কখনো কখনো, যেমন ''নয়নচারা''। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই গল্পে ময়ূরাক্ষীর স্মৃতিময় জনপদ উন্মোচিত যেন। গ্রামীণজীবনের নানা কুসংস্কার, ধর্মীয় অন্ধতা এবং ধর্মজীবীদের ভণ্ডামী ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের একটি বহু-ব্যবহৃত বিষয়। ''নয়নচারা'', ''মৃত্যুযাত্রা'', ''খুনী'', ''দুই তীর'', ''একটি তুলসী গাছের কাহিনী'', ''পাগড়ি'', ''সীমাহীন এক নিমেষে'' প্রভৃতি গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগাল্পিক প্রতিভার উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সুপরিস্ফুট। তাঁর গল্প প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র নির্মাণ। ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের ভাষা বিষয়ানুগ, চিত্রাত্মক, গীতোময় এবং অলঙ্কারসমৃদ্ধ। 'চিন্তাশীল চিত্রস্রোত, অবচেতনার ভগ্নক্রমপ্রবাহ' ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্যশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—

> তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তো-বা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয়তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্য-প্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে।
>
> [নয়নচারা/নয়নচারা]

বিভাগপূর্ব কালে ছোটগাল্পিক হিসেবে আবির্ভূত হলেও শওকত ওসমানের প্রথম গল্পসঙ্কলন প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকে। চল্লিশের দশক থেকে নব্বুইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় আবহ তাঁর গল্পে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় হয়ে আছে বন্দী। প্রথম দিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনপ্রাঙ্গণ থেকে চয়ন করেছেন তিনি গল্পের উপাদান। এ-পর্বে রোম্যান্টিকতা দ্বারাও প্রভাবিত ছিল তাঁর গল্পের চরিত্রেরা। কিন্তু ষাটের দশক থেকে তাঁর গল্পে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মোল্লা-মৌলভী-পাদ্রীদের ভণ্ডামী ও ধর্মব্যবসা আসতে থাকে ব্যাপকভাবে। ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে শওকত ওসমান প্রায়ই প্রকাশ করেন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাস্রোত, এবং সে-চিন্তাস্রোতে সিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর পুরুষেরা, তাঁর নারীরা। সদর্থকচেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে

তাঁর গল্পের নায়কেরা প্রায়ই মানবিক মহিমায় জাগ্রত হয়, নেতি আর নাস্তির জগতে বাস করেও তারা ইতিবাচক জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে ঘোষণা করে মানবিকতারই জয়গান। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রচিত তাঁর গল্পে এসেছে নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ এবং যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা এ-সময় অঙ্গীভূত হয় তাঁর ছোটগল্পে। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (১৯৭৫), 'মনিব ও তাহার কুকুর' (১৯৮৬), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৯০) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে শওকত ওসমান বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন উন্মোচন। আঙ্গিক-নিরীক্ষা, চরিত্রানুগ ভাষা-প্রয়োগ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক-প্রতীক ব্যবহার শওকত ওসমানের গল্পের অন্যতম সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। বিষয়াংশের সঙ্গে প্রকরণের শিল্পিত সম্পর্কে শওকত ওসমানের গল্প বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী।

বিভাগপূর্ব কালেই গল্পকার হিসেবে আবু জাফর শামসুদ্দিনের দীপ্র আবির্ভাব। সমাজসচেতনতা, সংস্কারমুক্ত জীবনপ্রত্যয় এবং উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আবু জাফর শামসুদ্দিনের জীবনার্থের মৌলচারিত্র। তাঁর ছোটগল্প ওইসব মানসতার শৈল্পিক-অঙ্গীকারে অর্জন করেছে বিশিষ্টতা। প্রথম দিকের গল্পে তিনি গ্রামীণজীবনের দৈনন্দিনতাকে নির্বাচন করেছেন প্রধান শিল্প-উপাদান হিসেবে। 'জীবন' (১৯৪৮), 'শেষ রাত্রির তারা' (১৯৬১) প্রভৃতি সঙ্কলনে পল্লিবাংলার জীবন ও প্রকৃতি হয়ে আছে উদ্ভাসিত। শেষ পর্বের গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের চিত্র এসেছে, তবে কখনোই নির্বাসিত হয়নি পল্লিজীবন। তাঁর গল্পে উচ্চারিত হয়েছে ধর্মান্ধতা কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। সামাজিক বৈষম্য আর অসঙ্গতিকে কখনো কখনো তীব্র বিদ্রূপবাণেও তিনি বিক্ষত করেছেন, সমাজে-সংসারে কামনা করেছেন প্রার্থিত মুক্তি ও মানবিক অন্তঃসঙ্গতি। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ''মৃত্যু ও প্রলাপ'' গল্পের সাবেরের মুখে উচ্চারিত যেন-

> আমার মত অন্ততঃ গড়ে বিশটা করে শিশু প্রত্যেকে জন্ম দিলে আগামী পনের বৎসরের মধ্যেই সেই যে বলেছি সংঘর্ষটার কথা তা লাগতে পারে এবং তাহলে এই অতি উঁচু নীচু ভেদটা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হতে পারে ত?

বিষয়াংশ ও ঘটনাবিন্যাসের প্রতি আবু জাফর শামসুদ্দিন মনোযোগী শিল্পী, কিন্তু প্রকরণনিরীক্ষার তাঁর সেই মনোযোগ বা সতর্কতা দুর্লক্ষ্য।

প্রথাশাসিত পথেই তিনি গল্পের আঙ্গিক বিন্যাস করেছেন, নতুন নিরীক্ষার হননি অগ্রসর। আঙ্গিকগত পরীক্ষায় তাঁর সামান্য প্রয়াসটুকুও হতে পারেনি সার্থকতাবিমণ্ডিত।

মুনীর চৌধুরী বেশ কিছু সার্থক গল্প রচনা করলেও, তাঁর কোন গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। নাটকের মতো, ছোটগল্পেও মুনীর চৌধুরীর প্রাতিস্বিকতা সহজেই লক্ষযোগ্য। প্রগতিশীল সমাজচেতনা এবং কৌতুকের আশ্রয়ে সামাজিক অসঙ্গতির চিত্ররূপায়ণই মুনীর চৌধুরীর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ''খড়ম'', ''মানুষের জন্য'', ''নগ্ন পা'', ''বাবা ফেকু'' প্রভৃতি গল্প স্মরণীয়।

আলোচ্য পর্বেই গল্পকার হিসেবে আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং সিকান্দার আবু জাফরের আবির্ভাব। দেশবিভাগের পূর্বেই প্রকাশিত হয় উভয়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'ত্রিস্রোতা' (১৯৪৪) এবং সিকান্দার আবু জাফরের 'মাটি আর অশ্রু' (১৯৪৬) মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার গল্পভাষ্য। পরবর্তীকালে এঁরা কেউই আর ছোটগল্প রচনা করেননি, যেমন করেননি মুনীর চৌধুরী।

বিভাগ-পূর্ববর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পের আসরে যে-সব লেখক আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই গল্পের শিল্প-উপাদান গ্রহণ করেছেন গ্রামীণ জীবন থেকে। এ-ক্ষেত্রে আবুল ফজল, আবু রুশদ প্রমুখ ব্যতিক্রম; এঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনজটিলতা উন্মোচন। এ-পূর্বে গল্পের আঙ্গিকনিরীক্ষা ও ভাষা-ব্যবহারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং মুনীর চৌধুরীর ব্যতিক্রমী প্রয়াস সহজেই লক্ষণীয়। অন্য লেখকরা আঙ্গিকের প্রতি ততটা নজর দেননি, যতটা দিয়েছেন ঘটনা ও চরিত্রের প্রতি। উদার মানবতাবাদী শিল্পীদের সাধনায় বাংলাদেশের ছোটগল্প অঙ্কুরেই অঙ্গীকার করেছিল যে প্রগতিশীল সমাজভাবনা ও মুক্ত চেতনাস্রোত, অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে আজ সে-প্রবণতাই আমাদের ছোটগল্পের প্রধান পরিচয়। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় বিভাগপূর্ব কালের ছোটগাল্পিকদের এই প্রভাবই, বোধ করি, সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রাক্-সাতচল্লিশ কালপর্বে বাংলাদেশের ছোটগল্পের এই ঋদ্ধ উত্তরাধিকারের উপরই নির্মিত হয় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তুরের গল্পভুবন।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্ব হিসেবে যে কালখণ্ড এখানে নির্দেশিত, সে-কালে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সকলেরই সিদ্ধি ঘটে বিভাগ-পরবর্তী কালে। কিন্তু লক্ষ করলেই ধরা পড়বে, এই আলোচনায়, ইতিহাসের ধারা অনুসরণে আমরা গল্পকার হিসেবে লেখকদের আবির্ভাব-সময়কে সর্বদা বিবেচনা করেছি। বয়োক্রম কিংবা পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রকাশের তারিখ নয়, আমরা প্রাধান্য দিয়েছি লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশ-তারিখের প্রতি। সে-হিসেবে সময়-ক্রমে বিশেষ কোন লেখকের আবির্ভাব যে-পর্বে, সে-পর্বের পটেই আমরা বিবেচনা করেছি বিশেষ ওই গল্পকারের সমুদয় সৃষ্টি।

৩.

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান' নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে পূর্ববঙ্গের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর অগ্রযাত্রা হলো বাধাপ্রাপ্ত। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববাংলার উঠতি পুঁজিবাদীগোষ্ঠী এবং নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণী অনুভব করলো তাদের অস্তিত্বের অন্তর্সংকট। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজির আর্থিক স্বার্থেই পূর্ববাংলা রূপান্তরিত হলো আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজবিকাশের এই প্রতিবন্ধকতা শিল্পীর চৈতন্যকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করলো। ফলতঃ বুর্জোয় মানবতাবাদে প্রত্যয়ী শিল্পীর মানসলোকে উপ্ত হলো সঙ্কটের বীজ। আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত হলো ইতিহাস-সৃষ্টিকারী ভাষা-আন্দোলন। আমাদের রাজনীতি এবং সমাজ—সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে ভাষা-আন্দোলন সঞ্চার করলো স্বাধিকার-প্রত্যাশী চৈতন্য। বায়ান্নর রক্তিম প্রতিবাদ পূর্ববাংলার জনমনে যেমন তোলে ঊর্মিল আলোড়ন; তেমনি সামন্ত-মূল্যবোধসিক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুদৃঢ় পলল ভিতও করে তোলে শিথিল। মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক এবং মার্কসীয় চেতনাপুষ্ট শক্তিসমূহ পূর্ববাংলার সমাজজীবনের প্রায় সকল স্তরে অতিদ্রুত প্রভাব

বিস্তার করতে থাকে—যার ফলে ১৯৫৪র সাধারণ নির্বাচনে বেনিয়া-পুঁজি ও সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগ, সকল প্রয়াস সত্ত্বেও, পরাজিত হয়; এবং প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট অর্জন করে বিপুল বিজয়। অতঃপর ১৯৫৮র আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বার বার মন্ত্রিসভার পতন সুগম করে দেয় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পথ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন-পূর্ব কাল-পরিসর এদেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশেষ পর্যায়। তাই আলোচ্য সময়সীমায় রচিত ছোটগল্পসমূহ আমরা বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের প্রথম পর্ব হিসেবে বিবেচনা করবো। সময়ের এই পর্ব-বিভাজন মোটেই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নয়; সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ-বিভাজন অবশ্যই সমাজসত্য-সম্মত।

বিভাগোত্তর কালে প্রথম দশকে ছোটগল্প রচনায় যাঁরা ব্রতী হন, তাঁদের মধ্যে সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬), মিরজা আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৮৪), শাহেদ আলী (১৯২৫-), আবু ইসহাক (১৯২৬-), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-), মিন্নাত আলী (১৯২৭-), শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১-), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-), বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-), আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৩৮-) প্রমুখ শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ-পর্বে প্রকাশিত ছোটগল্পসমূহ প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক ঘটনাংশ আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হলেও ঢাকা শহরের প্রকৃত নগরায়ণ ঐতিহাসিক কারণেই হয়েছে বিলম্বিত। ফলতঃ আমাদের শিল্পসাহিত্যেও নাগরিক চেতনার প্রতিফলন, এ-পর্বে, প্রায় অনুপস্থিত। তবু আলোচ্য কালখণ্ডের ছোটগাল্পিকদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখের রচনায় নির্মীয়মান মহানগর ও তার জীবনবৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হতে আরম্ভ করে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। পঞ্চাশের গল্পকার হিসেবে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁদের প্রধান প্রবণতা সমালোচক নির্দেশ করেছেন এভাবে—

...তাঁরা ছিলেন প্রবলভাবে জীবনবাদী ও সমাজসংলগ্ন। তাঁদের গল্পের বিষয়ে যেমন দেশবিভাগ পূর্বকালের জীবনচিত্র রূপায়িত তেমনি আছে বিভাগ পরবর্তী কালের। উদ্বাস্তুসমস্যা, মন্বন্তর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা গল্প লিখেছেন, তবে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের গ্রামজীবন। গ্রামের বা শহরের যে ধরনের বিষয় তখনকার গল্পকারেরা অবলম্বন করুন না কেন, গল্পে যাপিত জীবনের সংকট ও সমস্যার আলেখ্যই তাঁরা রচনা করেছেন। কোন কোন শিল্পীর রচনায় শ্রেণীসংগ্রামও প্রমূর্ত হয়েছে।[৫]

সরদার জয়েনউদ্দীনের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলার গ্রামজীবন। ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে স্বকালের সামাজিক অসঙ্গতিকে চিত্রিত করতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তাই তার সৃষ্টিতে ইতিহাসবোধ ও সমকালচিন্তার যুগলস্রোত লক্ষণীয়। তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য যুদ্ধ দাঙ্গা অসঙ্গতি ও অসাম্য—আর এইসব বিরূপতা-বৈনাশিকতা থেকে মানবিক মুক্তিকামনা। সরদার জয়েনউদদীনের গদ্যরীতি সরল ও চিত্তাকর্ষক, প্লট জটিলতামুক্ত, আর পরিচর্যা মূলত বর্ণনাধর্মী।

সত্তুরের দশকে প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও গল্পকার হিসেবে মিরজা আবদুল হাই-এর আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকে। সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরতে তিনি সিদ্ধহস্ত। সমস্ত প্রতিকূলতা ও অসঙ্গতি অতিক্রম করে তাঁর চরিত্রেরা অন্তিমে উদ্ভাসিত হয় মানবীয় সম্ভাবনায়, উত্তীর্ণ হয় মানবিক পরমার্থবোধে। মিরজা আবদুল হাই-এর ছোটগাল্পিক-পরিচর্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মনোবিশ্লেষণ ও আত্মকথনরীতি। তাঁর গল্পের ভাষা সাবলীল, সংহত এবং কৌতুকবোধসিক্ত।

মানবজীবনের মন্ময়প্রান্ত নিয়ে গল্প-রচনায় শাহেদ আলীর উৎসাহ সমধিক।[৬] কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) কিংবা তালিম হোসেনের (১৯১৮-) মতো ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনে গভীর বিশ্বাস শাহেদ আলীর শিল্পিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর গল্পে ওই মানসপ্রবণতার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। সামাজিক বৈষম্য, কৃষকজীবনের দুর্গতি, ধর্মজীবীর ভণ্ডামী এবং ইসলামী মূল্যবোধ—এইসব বিষয় ও প্রবণতা নিয়ে গড়ে উঠেছে শাহেদ আলীর গল্পভুবন। যুদ্ধোত্তর পটে আবির্ভূত হলেও শাহেদ আলীর গল্পে আধুনিক জীবনযন্ত্রণার কোন চিত্র রূপায়িত হয়নি। আধুনিক নগরসভ্যতার পরিবর্তে গ্রামীণ গণজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-যন্ত্রণাই তাঁকে গভীরভাবে

প্রাণিত ও পীড়িত করেছে। শিশু মনস্তত্ত্বের গল্প হিসেবে শাহেদ আলীর ''জিবরাইলের ডানা'' অর্জন করে বহুল প্রশংসা। ''সিতারা'', ''মা'', ''পুতুল'', ''মহাকালের পাখনায়'', ''একই সমতলে'', ''অতীত রাতের কাহিনী'' প্রভৃতি গল্প শাহেদ আলীর ছোটগাল্পিক-প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। কাব্যময়তা, সংহতি এবং অন্তিম ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে শাহেদ আলীর গল্প বিশিষ্ট।

আবু ইসহাকের গল্পে রূপায়িত হয়েছে গ্রামীণ বাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা আর দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্র-সংগ্রামের কাহিনী। গল্পের শরীরে তিনি এঁকে দিয়েছেন গ্রামবাংলার সামাজিক অনাচার, অর্থনৈতিক শোষণ এবং ব্যক্তিক অসঙ্গতির নানামাত্রিক চিত্র। ইতিবাচক জীবনবোধের আলোয় আবু ইসহাকের নায়কেরা সমস্ত অন্ধতা কুসংস্কার আর শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে একটি সুন্দর সমাজপ্রতিবেশ নির্মাণে হয়েছে জাগ্রত। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ''বিস্ফোরণ'', ''জোঁক'', ''খুঁতি'' প্রভৃতি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। শ্রেণীসংগ্রামের শিল্পভাষ্য হিসেবে ''জোঁক'' গল্প আবু ইসহাকের প্রগত জীবনবোধের পরিচয়বাহী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো, আবু ইসহাকও পল্লিবাংলার ধর্মব্যবসায়ীদের গোড়ামি ও ভণ্ডামী তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গের আবরণে। আবু ইসহাকের গল্প বর্ণনাপ্রধান এবং প্রথাশ্রয়ী, সেখানে নেই আঙ্গিক-সংগঠন বা ভাষা নিয়ে সতর্ক কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ।

আশরাফ সিদ্দিকীর গল্পও প্রগত জীবনবোধের উত্তাপে ঋদ্ধ। তাঁর গল্পের উপজীব্য বিষয় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আর ব্যর্থ প্রেমের মর্মদাহী যন্ত্রণা। তাঁর একটি জনপ্রিয় গল্পের নাম ''গলির ধারের ছেলেটি''। একটি অনাথ বালকের বেঁচে থাকার যে তীব্র আকূতি এ-গল্পে রূপান্বিত, বস্তুত, সে-আকূতিই আশরাফ সিদ্দিকীর গল্পসাহিত্যের কেন্দ্রীয় ভাবপরিমণ্ডল। তাঁর গল্পের ভাষা সরল ও সাবলীল; প্লট জটিলতামুক্ত এবং তা প্রধানত বর্ণনাত্মক পরিচর্যায় ঋদ্ধ। পল্লিবাংলার লোকায়ত জীবন নিয়ে গল্প রচনায় মিন্নাত আলী সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অধ্যাত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। গল্পের বক্তব্য প্রকাশে তিনি যতটা আগ্রহী, ততটা আগ্রহী নন গল্পের প্রকরণ-পরিচর্যায়।

নাগরিক মধ্যবিত্তের আশাবাদ, অসঙ্গতি আর নির্বেদ নিয়ে গল্প লিখেছেন শহীদ সাবের। অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা এবং অনুশীলনের অভাবে তাঁর গল্পগুলো অর্জন করতে পারেনি শৈল্পিক সাফল্য। প্রতীকাশ্রয়ী ছোটগল্প রচনায় তাঁর সিদ্ধি সমধিক।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর গল্পসাহিত্যের কেন্দ্রীয় বিষয় নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রেম-অপ্রেম, আনন্দ-বেদনা, আর স্বপ্ন-সংগ্রাম। তবে, বাংলাদেশের ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় প্রবণতা গ্রামীণজীবন সংলগ্নতা থেকে তাঁর গল্প একেবারে বিযুক্ত নয়। ছোটগাল্পিক সংহতি ও একমুখিতা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রোম্যান্টিক মানসপ্রবণতার প্রভাবে গাফফার চৌধুরীর গল্পে আমরা লক্ষ করি কাব্যময়তা ও আবেগী পরিচর্যার আধিক্য। উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষায় সমৃদ্ধ গাফফার চৌধুরীর গল্প-ভাষা। ইতিবাচক জীবনবোধের ছোঁয়ায় গাফফার চৌধুরীর গল্প বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্য যাঁদের সাধনায় সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে, হয়েছে প্রগত ও শিল্পিত, আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁদের অন্যতম। আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্পিমানসের বিকাশরেখা স্পষ্টতই দুটো ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন সমাজমনস্ক শ্রেণীসচেতন প্রগতিশীল কথাশিল্পী। কিন্তু ষাটের দশক থেকে শ্রেণীচেতনা ও সমাজবাস্তবতার পরিবর্তে মানুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, লিবিডোতাড়না এবং কালিক নির্বেদই হয়ে ওঠে তাঁর মানসদৃষ্টির মৌল-সূত্র। জীবনদৃষ্টির এই পশ্চাৎগতি আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পসাহিত্যের মৌল-ভূমিতে উপ্ত করেছে একটা বৃহৎ পরাভব ও সীমাহীন অবক্ষয়ের বীজ। ষাটের দশকে আজাদের পথ ধরেই বাংলাদেশের অনেক কথাশিল্পী অগ্রসর হলেন মনোবিশ্লেষণ, যৌনতা আর ভঙ্গি-সর্বস্বতার বঙ্কিম পথে। অথচ, মানিক-প্রভাবিত আলাউদ্দীন আল আজাদ গল্প রচনা সূচনা করেন মার্কসীয় শ্রেণীধারণায় সুগভীর বিশ্বাস রেখে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পে, প্রথম দিকে মানিকের উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী গল্পকার আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন বেশ ক'টি ভালো গল্প লিখেছেন। তাঁর হাতেই প্রথম শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের সার্থক

গল্প রচিত হয়েছে। 'জেগে আছি', তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ, এ জাতীয় গল্পের বলিষ্ঠ সংকলন। পরবর্তী সময়ে তিনি অবশ্য শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। 'যখন সৈকত' গল্পগ্রন্থের 'ধোঁয়া' গল্পে সিলেটের চা বাগানের শ্রমিকদের জীবন চিত্রিত করেছেন।[৭]

প্রথম পর্বের গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদের দেশ-কাল-শ্রেণীসচেতন মানসতার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। 'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'মৃগনাভি' (১৯৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রেণীচেতনায় সজাগ থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন মানবতার অপরাজেয় গৌরবগাথা। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের গল্পে মার্কসীয় শ্রেণীধারণা বিচ্যুৎ হয়ে তিনি জীবনের অন্তঃঅসঙ্গতি সন্ধানে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও যৌনধারণায় আকৃষ্ট হলেন। জীবনদৃষ্টির এই পশ্চাৎগতি তাঁর গল্পের শিল্পসিদ্ধিকেও করেছে ক্ষুণ্ন। মনোবিকলন ও মনোগহনের শিল্পরূপ হিসেবে তাঁর 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৮), 'উজান তরঙ্গে' (১৯৫৯), 'যখন সৈকত' (১৯৬৭), 'জীবন জমিন' (১৯৮৮) প্রভৃতি সঙ্কলনভুক্ত গল্পগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। আলাউদ্দিন আল আজাদ গল্পের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা-ব্যবহারে সচেতন শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। ছোটগাল্পিক সংহতি, নাটকীয়তা এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংহতি এবং ইঙ্গিতময়তায় ঋদ্ধ তাঁর গদ্যের এক উজ্জ্বল এলাকা—

> তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্র-গর্জনে একেকবার কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্ছ্বসিত শব্দের ভয়ংকর-সুন্দর রাগিণী।
>
> এভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, তখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।
>
> [বৃষ্টি]

কবিতার মতো, গল্প-নির্মাণেও, হাসান হাফিজুর রহমান রেখেছেন শৈল্পিক সিদ্ধির স্বাক্ষর। প্রগতিশীল সমাজচিন্তা হাসান হাফিজুর রহমানের শিল্পিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর গল্পে এনেছে প্রাতিস্বিক

মাত্রা। সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে মানুষের অরুন্তুদ পরিণতি তাঁর একাধিক গল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'আরো দুটি মৃত্যু' (১৯৭০) গল্পসঙ্কলনের গল্পগুলো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মানবাত্মার গৌরবময় জাগরণ-আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক শব্দপ্রতিমা হিসেবে বিশিষ্টতার স্বাক্ষরবাহী। কবির সৃষ্টি হলেও এসব গল্প রোম্যান্টিক কাব্যময়তা থেকে সর্বাংশে মুক্ত। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন-পর্যবেক্ষণ এবং প্রাগ্রসর সমাজের জন্য উজ্জ্বল আশাবাদই হাসান হাফিজুর রহমানের গল্পসাহিত্যের কেন্দ্রীয় ভাবপরিমণ্ডল। 'যে বস্তুবাদী বিশ্বনিরীক্ষা তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্যের প্রাণবিন্দু, ছোটগল্পের শরীরে ও বক্তব্যে তার প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম।....। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, মহামারী, শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র, জীবনের দৈনন্দিনতা ও অন্তর্লোক এবং সর্বোপরি মানুষের জাগতিক ও মানসিক দ্বন্দ্ববৈচিত্র্যকে গল্পের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান।'[৮] গল্পের প্রকরণ-প্রসাধনে হাসান হাফিজুর রহমান খুব যে সতর্ক ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না, তবে তাঁর কোন কোন গল্প সাঙ্কেতিকতা ও রূপকব্যঞ্জনায় অর্জন করেছে বিশিষ্টতা।

নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর হৃদয়রহস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে জহির রায়হানের গল্পভুবন। জহির রায়হানের সমাজসচেতন মানসতা এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনার্থের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে তাঁর ছোটগল্পে। মানবমনের গভীরতর রহস্যলোকে সন্ধানী আলো ফেলতে তিনি নিয়ত উৎসাহী শিল্পী। ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-প্রসাধনে জহির রায়হান পরীক্ষাপ্রিয় কথাকার। তাঁর গল্প-আঙ্গিক চিত্রনাট্যধর্মী, সংহত এবং কবিতাস্নিগ্ধ। তবে অতিনাটকীয়তার কারণে এবং উৎকণ্ঠার আধিক্যে কখনো কখনো তাঁর গল্প অর্জন করতে পারেনি শৈল্পিক সিদ্ধি। জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য দিয়ে, প্রাকরণিক প্রাতিস্বিকতা দিয়ে বাংলাদেশের গল্পের ধারায় জহির রায়হান সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা।

মনোগহনের জটিলতা ও অসঙ্গতি উন্মোচনে বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক অনতিক্রান্ত শিল্পী। প্রথম পর্বে সৈয়দ শামসুল হক বৃহত্তর জনজীবনের পটে গল্প লিখেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে মানবজীবনের অন্তঃঅসঙ্গতি ও অন্তঃবাস্তবতার গল্পরূপ অঙ্কনেই হলেন অধিক উৎসাহী। 'তাঁর গল্পে জীবন ভিন্ন সুর পেয়েছে, গল্পে দেখা দিয়েছে প্রাণ। দেহের কাঠামো ছাড়িয়ে গল্পে প্রাণের সম্ভার এবং শুধুমাত্র গল্পের

জন্য গল্প এই ধারণা থেকে গল্পের মুক্তি, ... তাঁর হাতেই প্রথম সার্থক ভাবে ঘটেছে।'[৯] নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অসঙ্গতি আর নির্বেদ অঙ্কনেই সৈয়দ শামসুল হকের মনোযোগ সমধিক। এর বাইরে জীবনের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে তিনি ফেলতে চাননি কোন সন্ধানী আলো। আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নাগরিক জীবনচর্যা নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে, বোধ করি প্রায়শই তিনি কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হয়েছেন। এসব গল্পের ভাবনা ও উপাদান আরোপিত, ফলে শিল্প-সার্থকতায় শীর্ষমুখ-অভিসারী হয়েও তা হঠাৎ-স্খলিত। ''আনন্দের মৃত্যু'', ''পরাজয়ের পর'', ''বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যে'', ''শেষ বাস'' প্রভৃতি গল্পে এ-ধরনের কৃত্রিমতা সুস্পষ্ট।

সৈয়দ শামসুল হকের গদ্যরীতির প্রধান লক্ষণ কাব্যময়তা। প্রতীক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে তিনি পাশ্চাত্য রীতিপ্রভাবিত প্রাগ্রসর সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়াংশ ও উপাদানের মতো, প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, কোন কোন গল্পে, মনে হয় আরোপিত; বিষয় ও ভাবের প্রয়োজনে তা অনিবার্য নয়। তবে কোন কোন গল্পে, যেমন ''রক্তগোলাপ''-এ তাঁর ভাষা বিষয়ানুগ, স্বচ্ছন্দ এবং গীতময়।

নাগরিক মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের গল্প-অবয়ব সৃষ্টিতে বোরহান-উদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় মানব-মনস্তত্ত্বের জটিলতা উন্মোচনেই তিনি সমধিক আগ্রহী। 'সমাজসত্যের উপলব্ধিতে তিনি অনেকাংশে আল আজাদের সমগোত্রীয়; আজাদ যেখানে প্রত্যক্ষ ও উচ্চকণ্ঠ, বোরহানউদ্দীন সেখানে পরোক্ষ ও নির্লিপ্ত।'[১০] ভাষা ও প্রকরণে স্বাতন্ত্র্য আনতে গিয়ে বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রায়শই আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতার শিকার হয়েছেন, যা ক্ষুণ্ন করেছে তাঁর গল্পের শিল্পমূল্য। বোরহানউদ্দীনের ভাষা স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী, কিন্তু তা ছোটগল্পের জন্য একান্তই অনুপযোগী।

প্রধানত শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক হলেও ছোটগল্প রচনায়ও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। নগরজীবনের পটে তিনি উন্মোচন করেন মানব-অস্তিত্বের বহুমাত্রিক জটিলতা। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তিনি কুশলী শিল্পী। ''সম্রাজ্ঞীর নাম'', ''চোর'' প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'প্রহেলিকা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫৯) গ্রন্থে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ মানবিক সম্ভাবনার জয়গাথা নির্মাণ করেছেন। তাঁর গল্পের ভাষা সরল ও বিষয়ানুগ, প্লট জটিলতামুক্ত ও সংহত।

পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বোধ করি এই যে, আমাদের ছোটগল্প এ-পর্বেই প্রথম হয়ে ওঠে মৃত্তিকামূলস্পর্শী ও জাতিসত্তার শিকড়-অন্বেষী। গল্পকাররা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকরণ-পরিচর্যার প্রতিও ক্রমশ মনোযোগী হয়ে ওঠেন এ-কালখণ্ডে। বিষয়াংশ-উপস্থাপনার অভিনবত্ব এবং নিরীক্ষাশীল ভাষারীতি দিয়ে এ-পর্বের শিল্পীরা সূচিত করে দেন ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের প্রকরণ- প্রসাধনের ঋদ্ধ পথযাত্রা।

৪.

ষাটের দশকে বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে সূচিত হয় একটি নতুন স্রোত। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কল্লোল আর সংক্ষোভের পটে রচিত এ-কালের গল্প যথার্থ অর্থেই উদ্ভাসিত করেছে ষাটের উন্মাতাল বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে। 'একদিকে সামরিক শাসনের পেষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙ্গালী পুঁজির বিকাশ; অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়কে অস্থির করে তোলে। এই সময়ে অগ্রজ গল্পকারেরা যখন গল্পের জগৎ থেকে এক প্রকার প্রস্থান করেছেন, তখন উঠে এসেছেন নতুন প্রজন্মের গল্পকারেরা।'[১১]

আলোচ্য পর্বে ছোটগাল্পিকচৈতন্যে আমরা লক্ষ করি দুটি প্রবণতা। একদিকে রয়েছেন সেইসব শিল্পী, যাঁরা সামরিকশাসনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে আশ্রয় নিলেন বেতার-টেলিভিশন-বি এন আর-প্রেসট্রাস্টের নিরাপদ সৌধে। এঁদের রচনায় এলো পলায়নী মনোবৃত্তি, ফ্রয়েড-এলিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা নির্মাণ করলেন মৈথুন-সাধনার শব্দমালা। অপরদিকে আছেন সেইসব শিল্পী, যাঁরা বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, যুগসংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে গল্পের শরীরে জ্বেলে দিয়েছেন সমাজ-প্রগতির আলোকবর্তিকা। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও এঁরা ছিলেন সত্যসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজভাবনায় উচ্চকিত।[১২] ষাটের দশকে যে-সব গল্পশিল্পী বাংলাদেশের সাহিত্যে আবির্ভূত হন, তাঁদের শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করলেই আমাদের উপর্যুক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। যে-সব ছোটগাল্পিক সময়ের এ-পর্বে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন, তাঁরা হচ্ছেন—নাজমুল আলম (১৯২৭-), সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

(১৯৩৩-), মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪-), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫-), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), শওকত আলী (১৯৩৬-), বশীর আল হেলাল (১৯৩৬-), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯-), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৯-) রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-), রাহাত খান (১৯৪০-), বুলবন ওসমান (১৯৪০-), মাহমুদুল হক (১৯৪০-), দিলারা হাশেম, রশীদ হায়দার (১৯৪১-), আবদুস শাকুর (১৯৪১-), মাহবুব তালুকদার (১৯৪১-), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৫), আহমদ ছফা (১৯৪৩-), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-), সুব্রত বড়ুয়া (১৯৪৫-), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-), কায়েস আহমদ (১৯৪৮-১৯৯২) প্রমুখ। শৈল্পিক সিদ্ধি এবং জীবনার্থের প্রশ্নে এঁদের অনেকের মধ্যে রয়েছে মেরুদূর ব্যবধান; তবু আমরা তাঁদের একই পংক্তিতে বিন্যস্ত করেছি—কেননা, এঁদের সকলেরই রয়েছে অভিন্ন কুললক্ষণ—এঁরা সকলেই দ্রোহ-বিদ্রোহ-সংক্ষোভ-সংগ্রামময় উত্তাল ষাটের গল্পকার।

নাজমুল আলম, সুচরিত চৌধুরী, মূর্তজা বশীর, মাফরুহা চৌধুরী, হুমায়ুন কাদির, হাসনাত আবদুল হাই, রিজিয়া রহমান, বুলবন ওসমান, মাহবুব তালুকদার প্রমুখ শিল্পীর গল্পরচনাপ্রয়াস ষাটের দশকে শুরু হলেও, এ-দশকের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকরণ-সতর্কতা এবং মনোগহন-বিশ্লেষণ এঁদের রচনায় অনুপস্থিত। নাগরিক মধ্যবিত্তের অতলযাত্রা আর অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে গল্প লিখেছেন নাজমুল আলম এবং সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্। চট্টগ্রামের লোকায়ত জীবন এবং লোকগাঁথা-কিংবদন্তী নিয়ে সুচরিত চৌধুরী অনেকগুলো গল্প লিখেছেন, যা বাংলাদেশের গল্পের ধারায় সংযোজন করেছে একটি নতুন মাত্রা। মূর্তজা বশীর, রিজিয়া রহমান, আহমদ ছফা, বুলবন ওসমান এবং মাহবুব তালুকদারের গল্পে ধরা পড়েছে সমাজসচেতন মানস-প্রবণতা এবং সমাজপ্রগতির বাসনা। ইতিহাস-ঐতিহ্যের গল্প-অবয়ব সৃষ্টিতে রিজিয়া রহমান বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ''অগ্নিস্বাক্ষরা'' গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে তাঁর গল্পে পরিলক্ষিত হয় উপকাহিনীর আধিক্য, যা ছোটগল্পের শরীরে জড়ো করে উদ্বৃত্ত মেদ। মাফরুহা চৌধুরী নাগরিক মধ্যবিত্তের হার্দ্যজটিলতা উন্মোচনেই সমধিক আগ্রহী। হাস্যকৌতুক আর ব্যঙ্গের ধারায় বাংলাদেশের গল্পে শহীদ আখন্দ রেখেছেন বিশিষ্টতার স্বাক্ষর। ব্যঙ্গের আবরণে সুকৌশলে তিনি উন্মোচন করেন মানবজীবনের গভীরতর কোন সত্য-উপলব্ধি। সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকের ধারায় আবদুস শাকুরের সিদ্ধিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সামাজিক অসঙ্গতি ও নাগরিক মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক জটিলতা উন্মোচনে আবদুস শাকুর সরস ব্যঙ্গ-

কৌতুকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গ্রাম ও নগরের পটে নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিনতা নিয়ে গল্প লিখেছেন হাসনাত আবদুল হাই। তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রকরণ-সতর্কতা। চিত্রলতা, আবেগী ভাষা এবং সংহত সংলাপ হাসনাত আবদুল হাই-এর ছোটগল্পের জনপ্রিয়তার মৌল কারণ। হুমায়ুন কাদির, মাহমুদুল হক, দিলারা হাশেম প্রমুখ শিল্পীর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে আধুনিক মানুষের একাকিত্ববোধ, হার্দিক রক্তক্ষরণ এবং অতীত স্মৃতিমুগ্ধতা। নাগরিক মধ্যবিত্তের বিকৃতি, অসঙ্গতি আর সদর্থক জীবনচেতনায় উত্তরণের ইতিকথা নিয়ে গড়ে উঠেছে বশীর আল হেলালের গল্পভুবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত তাঁর গল্পের এক বিশাল এলাকা জুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক স্মৃতি-অনুষঙ্গ।

বাংলাদেশের গল্প-সাহিত্যের ধারায় শওকত আলীর অবদান বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মচিহ্নিত। নাগরিক মধ্যবিত্তজীবনের বহুমাত্রিক অসঙ্গতির চিত্র-অঙ্কনের ষাট-দশকী মৌল প্রবণতার পথ ছেড়ে গল্পে তিনি বিচরণ করেছেন গ্রামীণ জীবনতটে, গ্রামের নিরন্ন-নিঃস্ব খেটে-খাওয়া মানুষের যন্ত্রণা ও সংগ্রাম ও দহনের পোড়োজমিতে। শওকত আলী শ্রেণীসচেতন শিল্পী, তাই বস্তুবাদী সমাজচিন্তার আলোকে তিনি তুলে ধরেন গ্রামীণ মহাজনশ্রেণীর শোষণের চিত্র, নির্মাণ করেন সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের জয়গাথা। ''নবজাতক'' গল্পে তাঁর সাহসী মানুষ মস্তাজ আলী মহাজনী-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এভাবে—

> চুপ করে থাকে সবাই। মা বাপ সন্তান চুপ করে থাকে। আগুনে কাঠের চ্যালা পোড়ে, নানা শব্দ হয়। ধীরে ধীরে আবার কথা বলে মস্তাজ আলী। মনোহর বোষ্টমের গানের কথা বলে, ধান নিয়ে আধিয়ার কিষাণের কথা ওঠে। মহাজন সেদিনও এমনি করেই মেরেছিলো। মহাজনরা চিরকাল এমনি করেই মারে।

'লেলিহান সাধ' (১৯৭৩) কিংবা 'শুন হে লখিন্দর' (১৯৮৬) সঙ্কলনের কোন কোন গল্পেও উচ্চারিত হয়েছে এই প্রতিবাদ। সমালোচকের ভাষায়— ''লেলিহান সাধ' গল্পে মহাজনের ঘরে আগুন দেয়ার মধ্যেই রয়েছে সংগ্রামী মানুষের তীব্র প্রতিবাদ, কিংবা বৃদ্ধ সাঁওতাল কপিলদাসের বহু দিনের ভুলে যাওয়া তীর ছোঁড়ার অভ্যাস আবার রপ্ত করার মধ্যে রয়েছে শত্রু ঘায়েল করার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। 'শুন হে লখিন্দর' গল্পে বঞ্চিত মানুষের নির্মম প্রতিশোধ-বাসনা মনসামঙ্গলের মিথে অতি চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন শওকত আলী।''[১৩] তবে 'উন্মূল বাসনা' (১৯৬৮) থেকেই লক্ষ করা গেছে, নর-নারীর যৌনপ্রবৃত্তি ও আদিমকামনা রূপায়ণে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠছেন উৎসাহী। এ-পথে পা বাড়িয়ে তিনিও, আলাউদ্দিন আল আজাদের মতো বৃহত্তর লোকজীবনের প্রাঙ্গণ ছেড়ে আত্মকুণ্ডয়নে হয়েছেন নিমগ্ন। ফলে 'মস্তাজ আলী ও হাসান আলীর সঙ্কট, রহিম শেখের মৃত্যু,

মহাজনদের হাতে জীবনকে নিঃশেষ করে দেয়া—ইত্যাদি ছবিতে যে শওকত আলী কথা বলে ওঠেন, তার সাথে আজকের শওকত আলীর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না—যেমন পাওয়া যায় না 'জেগে আছি'র আলাউদ্দিন আল আজাদকে 'যখন সৈকত' অথবা তার পরবর্তী গল্প-গুলোতে।'[১৪]

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হাসান আজিজুল হক বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সংযোজন করেছেন প্রাতিস্বিক মাত্রা। উত্তর-বাংলার গ্রামীণজীবন তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় শিল্প-উপাদান। বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনা, কখনো-বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী। শাহরিক আত্মকেন্দ্রিক জীবনের নির্বেদ ও আপাত-আনন্দের উচ্ছ্বাস উপেক্ষা করে তিনি গ্রামীণ মেহনতী মানুষের সমষ্টিগত জীবন-অর্ণবে করেছেন অবগাহন—বাংলা গল্পের ধারায়, এভাবে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর আপন ভুবন, স্থাপন করেছেন 'নিজস্ব এক উপনিবেশ'। বস্তুত, হাসান আজিজুল হক হচ্ছেন সেই ব্যতিক্রমী গল্পকার, যাঁর বেশ কিছু গল্প নির্দ্বিধায় সমগ্র বাংলা গল্পের আসরে প্রথম পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য। কখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কি কমলকুমার মজুমদার, কখনো-বা ম্যাক্সিম গোর্কির প্রভাব পড়েছে হাসানের উপর—তবু হাসান আজিজুল হক এইসব প্রভাববলয় অতিক্রম করে অবশেষে বাংলা গল্পধারায় স্থাপন করেন নিজস্ব মৌলিকতার শিল্পলোক। হাসান আজিজুল হকের প্রাতিস্বিকতা-নির্দেশে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> হাসান আজিজুল হক জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রজ গল্পকার। তিনি কোনো কোনো গল্পে— যেমন 'সারা দুপুর' বা 'সুখের সন্ধানে'—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, আবার কখনো—যেমন 'জীবন ঘষে আগুন' নামক অসামান্য গল্পে তিনি বিস্ময়করভাবে, অথচ স্পষ্টতই কমলকুমার মজুমদারের, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কমলকুমারের ভাষারীতি ধার নিয়েছেন। এই সবই নিশ্চয় তন্নতন্ন অনুসন্ধানের বিষয়, তবু জ্যোতিরিন্দ্র বা কমলকুমারের সঙ্গে এই লেখকের স্বভাবেই মিল নেই। তবু এই গল্পে বিশেষ করে কমলকুমারের অনুভূতি ও চিন্তার নিজস্ব মৌলিকতা ও বর্ণাঢ্যতা হাসান আজিজুল হকের মধ্যে সক্রিয় ছিল বলেই তিনি ঐ গল্পে কমলকুমারের ভাষার মডেল ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। অন্যত্র ঐ মডেল ব্যবহার করেননি। তিনি, যেমন আগেই বলেছি, জগদীশচন্দ্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রজ। গোত্রজ, কিন্তু তিনি যা জেনেছেন,

> দেখেছেন, তাই দিয়ে এক বহুস্তর অভিজ্ঞতার জগৎ-ই শুধু তিনি রচনা করেননি, প্রেক্ষিতের স্বাতন্ত্র্যে গড়ে তুলেছেন এক নিজস্ব ভুবন; স্থাপন করেছেন এক নিজস্ব উপনিবেশ।[১৫]

উত্তরবাংলার গ্রামীণ জনপদের ভাঙন, সামাজিক শোষণ, কখনো প্রতিবাদ, বাঁচার সংগ্রাম—এইসব কথা নিয়ে হাসানের গল্পজগৎ। তাঁর সব গল্পেরই 'মূলে আছে বাঁচা, জান্তবভাবে বাঁচা, শিশ্নোদর-পরায়ণভাবে বাঁচা, স্থূলতম শারীরিকভাবে বাঁচা এবং সেই বাঁচা থেকে মুক্তির সত্য এবং তার চেয়েও বেশি সেই মুক্তির চেষ্টার পরাভবের সত্য। সেই বাঁচার ন্যূনতম অস্তিত্বের নানান চেহারা, আর তার থেকে মুক্তির রূপও হরেক রকম। আর তা থেকে পরাজয়ের রূপও হরেক রকম। টিকে থাকার, বাঁচার, হেরে যাওয়ার বিস্বাদ, কটু, প্রায় নিয়তিবাদী, উপলব্ধি, শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায়, 'নিরুচ্ছ্বাস আর্তি' নিয়ে'[১৬] গড়ে উঠেছে হাসানের ধ্রুপদী-বিশাল গল্পভুবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে তিনি লিখেছেন বেশ কিছু সার্থক ছোটগল্প, যা প্রধানত গ্রথিত হয়েছে 'জীবন ঘষে আগুন' (১৯৭৩) এবং 'নামহীন গোত্রহীন' (১৯৭৫) গল্পসঙ্কলনে। প্রধানত কৃষির সঙ্গে জড়িত গ্রামীণ মানুষের জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন হাসান। কিন্তু স্রষ্টার ব্যতিক্রমী জীবনার্থের স্পর্শে তাঁর গল্পগুলো হয়ে উঠেছে শাশ্বত মানবাত্মার প্রতিভূ। প্রথম পর্বের গল্পে তিনি যৌনতা এবং মানুষের আদিম কামনার শিল্পচিত্র নির্মাণে ছিলেন উৎসাহী। সামাজিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় ধরতে তিনি ব্যক্তিমানুষের যৌনজীবনের পদস্খলনকেই তাঁর গল্পের শিল্প-উপাদান হিসেবে নির্বাচন করেছেন প্রাক্-সত্তুর গল্প-পর্বে।[১৭] কিন্তু ক্রমে তিনি অবগাহন করেছেন রাঢ়বাংলার বৃহত্তর জনজীবনসাগরে, এবং সেখান থেকে তুলে এনেছেন বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী সুধা, দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সূর্যদীপ্র বাণী।

ভাষা-প্রয়োগ এবং সংলাপ-নির্মিতিতে হাসান আজিজুল হক পরীক্ষাপ্রিয় কথাশিল্পী। কখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনো-বা কমলকুমার মজুমদার তাঁকে প্রভাবিত করেছে প্রতিবেশ-নির্মাণ কিংবা বাক্যগঠন-প্রক্রিয়ায়। যেমন 'জীবন ঘষে আগুন' গল্প, যেখানে গদ্যরীতিতে পাই কমলকুমারের উত্তাপ—

> রাজার হাতি এসে গেল। তার মেঘের মতো শরীর, তার স্থূলোদর, সেই মহাকায় পদ চতুষ্টয় নিয়ে হেলতে দুলতে মাঠের মাঝখানে দেখা দিল। সেখানে কোন বৃক্ষ ছিল না, কোনো বট বা অশথ—শুধু কিছু কাঁটা গাছ, পানসে ছায়া

বাবলা, বড় জোর সেয়াকুল ধরনের গুল্ম এইসব মাঝে মাঝে। আর অনেক বড় লাল মাঠ—গরমের তড়াসে পীড়িত অসংখ্য গর্ত ইত্যাদি।

—ডিটেইলকে সংহত উপায়ে স্বল্পকথায় এখানে ধারণ করেছেন হাসান, যেমন করেন কমলকুমার। চিত্রল-পরিচর্যায় গল্প-প্রতিবেশ সৃষ্টিতে হাসান আজিজুল হকের সিদ্ধি শিখরবিন্দুস্পর্শী। তবে কখনো কখনো অতিকথন ('নামহীন গোত্রহীন'), কখনো-বা বর্ণনার বিস্তৃত আয়োজন ('জীবন ঘষে আগুন') ক্ষুণ্ন করেছে তাঁর ছোটগাল্পিক সিদ্ধিকে। প্রকৃতির চিত্র-অঙ্কনে তাঁর নৈপুণ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরিত্রের অন্তর্সত্তার অনুগামী হয়ে উঠে আসে হাসানের নিজস্ব প্রকৃতিলোক। তাই দেখি, সংগ্রামমুখর বঞ্চনাপীড়িত জীবনে তাঁর প্রকৃতি আসে রুক্ষতার আবরণে, বিবর্ণসত্তায়—

> সমস্ত স্থান চর্বির গন্ধে ভরে যায়। অতএব অতিশয় দাহ্য—চর্বি কাঁচাও পোড়ে, তার জল পটপট শব্দে উবে যায়। একথাও অবশ্য যথার্থ যে সূর্যের গোলাটি মন্ত্রবলেই যেন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে—মরণরত শূকর তাকে আহ্বান জানায়, সে প্রত্যূষের স্নিগ্ধতা ছিঁড়ে খুঁড়ে চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে আসে—মুহূর্তেই হাওয়া অদৃশ্য উজ্জ্বলন্ত তামার পাতে পরিণত হয়—পাখীগুলি ভেগেছে, আর উপায় কি? এই দেশ এখন খুবই দাহ্য—পাহাড়ের মতো সুউচ্চ দীর্ঘ পাড়গুলি নির্ধুম অগ্নিগিরি, আপনকারদের নিষ্ঠুরতার প্রচণ্ড ভার নিয়ে ছড়িয়ে আছে, তাদের গায়ে সামান্য সামান্য কাঁটা গাছ রোদে ঝলসায়, তামাটে ঘাস কেটে কেটে পথগুলি পর্যন্ত অল্প এগিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—এইসব বিভিন্ন পথ দিয়ে আরও দাহ্য মানুষজন নীরবে আসে।
>
> [জীবন ঘষে আগুন]

ষাটের উত্তালতা আর সংক্ষোভ আর নির্বেদের জগৎ থেকে গৃহীত হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পসাহিত্যের মৌল-উপাদান। নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা, রতিবিলাস ও অন্তঃসারশূন্যতার গল্প-অবয়ব নির্মাণেই তিনি অধিক আগ্রহী। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং আত্মকথনরীতির সাহায্যে তিনি উন্মোচন করেন চরিত্রের অন্তর্লোক, কখনো-বা চেতনতলউদ্ভাসী টুকরো চিত্রকল্পের সাহায্যে তুলে ধরেন বিশেষ কোন চরিত্রের অন্তর্সত্তা। মগ্নচেতনাপ্রবাহের পথেও তিনি কখনো কখনো বিচরণ করেন মানবঅস্তিত্বের মৌলসঙ্কট উন্মোচনে। সূচনা-পর্বে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত গল্প লিখেছেন গ্রামীণ নিম্নবিত্তজীবন নিয়ে, এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধি শীর্ষবিন্দু-অভিসারী। ''কেষ্টযাত্রা'', ''রংবাজ ফেরে না'' প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ''কেষ্টযাত্রা'' যথার্থ অর্থেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক উজ্জ্বল নির্মাণ। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নাগরিক মধ্যবিত্ত-আলয়ে সন্ধান করলেন তাঁর গল্প-উপাদান। এবং এভাবে, আপন ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুৎ হয়ে তিনি ক্রমশ হয় উঠলেন—বিষয় ও প্রকরণে—

কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। 'বহেনা সুবাতাস' (১৯৬৭) এবং 'সীতাংশু, তোর সমস্ত কথা' (১৯৬৯) গল্পগ্রন্থ থেকে দুটো অংশ উদ্ধৃত করলে উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রমাণিত হবে—

ক. ভালো করে চোখ মেললে দেখা যায়, টেলিগ্রাফের তারে বসে দোল খাওয়া ল্যাজ ঝোলা পাখী, গৃহস্থের জীর্ণ কুটিরের প্রাঙ্গণে খড়ের মাড়াই, ঘরের পেছনে দাঁড়ানো কৌতূহলী কৃষক-রমণী অথবা অকস্মাৎ গাড়ী এসে পড়ায় বিব্রত, ডোবায় স্নানরতা পল্লীবালা সকলেই পরপর সকলেই আসছে এবং যাচ্ছে।

[লৌহবেষ্টনী]

খ. এই রকম ঘটে চলেছে অনেক কাল। তবু শেষ আশ্রয় ছিলো বাসনা। রাত্রির কায়াহীন প্রশান্তিতে, শৈশবের কুয়াশায়, কৈশোরের বকুল তলে, যৌবনের দগ্ধভূমিতে বিচরণ করে কেবল মাত্র তারই কথা স্মরণ করে রক্তের স্পন্দনকে উৎসাহ দিয়েছি।

[ক্রীতদাসী বাসনা]

—প্রথম উদ্ধৃতিতে ভাষা ও বর্ণনার স্বতঃস্ফূর্ততায় ফুটে উঠেছে গ্রাম-প্রতিবেশের একটি মুগ্ধ ছবি; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ভাষা কষ্ট-কল্পিত, জটিলতা-আক্রান্ত—ফলে ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে তা হয়ে পড়েছে অক্ষম। তবে চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'পুনরুদ্ধার'-এ (১৯৮৯) জ্যোতিপ্রকাশ আবার খুঁজে পেয়েছেন তাঁর স্বক্ষেত্র, বলা যায় নিজেকেই তিনি পুনরুদ্ধার করেন পুনর্বার। উত্তরবাংলার জীবনপটে এখানে আবার তিনি ফিরে এসেছেন বৃহত্তর লোকালয়ে, তুলে ধরেছেন বাঙালির স্বপ্ন আর সংগ্রাম আর সম্ভাবনার কথা। ''মন্বন্তর'', ''বিচার চাই'', ''সম্রাট'', ''দিন ফুরানোর খেলা'' প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

প্রতীকীব্যঞ্জনা এবং চেতনাপ্রবাহরীতির পরিচর্যা জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের ছোটগল্পের অন্যতম প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য। সংহত স্বল্পবাক নির্মেদ সংলাপ-নির্মাণের গোপনমন্ত্র তাঁর করতলগত। আবেগ, কাব্যময়তা আর উচ্ছ্বসিত নাটকীয়তা থেকে জ্যোতিপ্রকাশের গল্প সর্বাংশে মুক্ত। গল্পের ফর্ম-নির্মাণে তিনি নিয়ত পরীক্ষাপ্রিয়। এইসব বৈশিষ্ট্য জ্যোতিপ্রকাশের গল্পকে এনে দিয়েছে বিশিষ্টতা; কেবল বাংলাদেশের সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতেই একথা, বোধ করি, বলা সম্ভব।

নগরসভ্যতার অসঙ্গতি আর বিকৃতি উন্মোচিত হয়েছে রাহাত খানের ছোটগল্পে। মধ্যবিত্তজীবনই তাঁর গল্পের মৌল-উপাদান। নাগরিক মধ্য-বিত্তের অসঙ্গতি ও নির্বেদ তাঁর গল্পে উপস্থিত হয় যৌনতার প্রেক্ষাপটে, ফলে সেখানে প্রায়শই দেখা যায় আদিমকামনার খোলামেলা স্থূল চিত্র।

ঢাকা শহরের অভিজ্ঞতালোক থেকেই রাহাত খান চয়ন করেছেন তাঁর গল্প-উপাদান। ফড়িয়া, দালাল, উঠতি ব্যবসায়ী, ধূর্ত রাজনীতিবিদ, বড়লোকের রক্ষিতা, আদর্শহীন থ্রিলার লেখক— এই সব চরিত্র বার বার ঘুরে-ফিরে আসে রাহাত খানের ছোটগল্পে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সামাজিক ভাঙন নিয়ে তিনি লিখেছেন কয়েকটি ভালো গল্প। রাহাত খানের ভাষা সাবলীল এবং কৃত্রিমতামুক্ত, ফলে পাঠকনন্দিত। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন গল্পের ফুলেল-শরীর। যেমন—

> কাশীপুর ডাউন বাসটা জলবাতাস খেয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে একটু আগে চলে গেছে। খুব দুর্যোগের দিন। একে ভীষণ ঠাণ্ডা, তার উপর বইছে ঝড়ো বাতাস। চারদিক নষ্ট কাঁচের মত ঘোলাটে আলো জেগে আছে। সকাল না দুপুর না বিকাল, চেনা যায় না। ভারী দুর্যোগের দিন। পাকা সড়কের দুপাশে দুই চার পাঁচটা দোকান এখনো খোলা। আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গোপাল ঘোষ দোকানের ঝাপ খানিকটা খোলা রেখে চড়া ভল্যুমে ট্রানজিস্টার ছেড়ে দিয়েছে। জয়বাংলা ফার্মেসীর আবু ডাক্তার বন্ধ ঘরে আলো জ্বালিয়ে তাসের আসর বসিয়েছে। এই রকম দশা এখন বাজারের, খদ্দের নেই, বেশীর ভাগ দোকান বন্ধ। পাকা সড়কের এ মাথা ও মাথা লোকশূন্য। দুপাশের জঙ্গল ব্যপে ঝড়ো-বাতাসের ভীষণ তাণ্ডব।

নাগরিক মধ্যবিত্তের নির্বেদ-ব্যর্থতা-বিকৃতি-অসঙ্গতির পটে গল্প লিখেছেন রশীদ হায়দার। মধ্যবিত্তের পরাভব নিয়ে গল্প লিখলেও, কাহিনীর অন্তিমে তিনি উপস্থিত করেন উত্তরণের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত। সমাজসচেতনতা রশীদ হায়দারের শিল্পিমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রগত সমাজচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর মানুষেরা; তাঁর গল্প আমাদের শোনায় মানবিক সম্ভাবনার জয়গাথা, সদর্থক চেতনায় উত্তরণের বিজয়মন্ত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে রচিত তাঁর অনেক গল্পে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতি-অনুষঙ্গ। 'অন্তরে ভিন্ন পুরুষ' (১৯৭৪), 'মেঘেদের ঘরবাড়ী' (১৯৮২) প্রভৃতি গ্রন্থে স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকা শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের সামূহিক অবক্ষয় পেয়েছে ভাষারূপ। রশীদ হায়দারের গল্পের ভাষা স্ফটিকসংহত, মেদমুক্ত, এবং প্রতীকী-পরিচর্যাঋদ্ধ।

ষাটের দশকে আমাদের ছোটগল্পের অঙ্গনে যে-সব প্রতিভাধর শিল্পী আবির্ভূত হয়েছেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁদের অন্যতম। পুরোনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণুতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা আর জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের সমৃদ্ধভুবন। পুরোনো ঢাকাকে ইলিয়াসের মতো এমন অনুপুঙ্খভাবে আর কেউ দেখেননি। তাঁর গল্পে কাহিনী অপেক্ষা

চরিত্র-মনস্তত্ত্ব মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, যা আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নেতি দিয়ে শুরু করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর চরিত্রকে সমাপ্তিতে পৌঁছে দেন ইতির রাজ্যে। ডিটেইল তাঁর গল্পে উঠে আসে অবলীলায়। তবে কখনো কখনো এক গল্পের মধ্যে একাধিক উপগল্প পীড়িত করে মূল গল্প-স্রোতকে। প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি লিখেছেন মোট তেইশটি গল্প—এমনই স্বল্পপ্রজ এই শিল্পী। তবে হাতে গোনা এই গল্পগুলোর মধ্যেই ফুটে উঠেছে জীবনের বিচিত্র প্রান্ত, উপলব্ধির বহুবর্ণিল জগৎ। তাঁর 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের আন্ত্যন্তিক বিনষ্টি, 'খোঁয়ারি'-তে (১৯৮২) যুব-মানসের নির্বেদ; 'দুধভাতে উৎপাত'-এ (১৯৮৩) নিরন্ন মানুষের জীবনে অমোঘ নিয়তিশাসন, আর 'দোজখের ওম' (১৯৮৯) গ্রন্থে নেতি থেকে ইতিতে উত্তরণের কথকতা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রকরণ-পরিচর্যায় নিরীক্ষাপ্রিয় শিল্পী। অ্যান্টি-রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণে প্রাত্যহিক ভাষায় তিনি নির্মাণ করেন যাপিত জীবনের চালচিত্র। পুরোনো ঢাকার ভাষা, কুট্টিদের খিস্তি খেউড়, আর বাখরখানি-সংস্কৃতি ইলিয়াসের গল্পে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত যেন। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন দীর্ঘ বাক্যগঠনে; 'এই দীর্ঘ বাক্যপাঠে অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে তাঁর গদ্য বিরক্তিকর হলেও সজ্ঞান হৃদয়সংবাদী পাঠক গল্পের ভেতরে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হন না।'[১৮] ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনীবয়ন ইলিয়াসের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ষাটের গল্পকারদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ সবচেয়ে বেশি প্রাতিস্বিকতাবিলাসী শিল্পী। আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার গল্পভাষ্য নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিষয়াংশ এবং প্রকরণের অভিনবত্বে তাঁর গল্পসাহিত্য বিশিষ্টতার দাবীদার। তবে, প্রথম পর্বের গল্পে, কনটেন্ট ও ফর্মে, আরোপিত উপাদান গল্পের মূলস্রোতের সঙ্গে জৈবসমগ্রতায় একাত্ম হতে পারেনি। বিচ্ছিন্নতা ও নির্বেদের যন্ত্রণায় তাঁর অধিকাংশ নায়ক পীড়িত ও পর্যুদস্ত। প্রতীকী এবং পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম পর্বের গল্পের ভাষারীতিতে আরোপিত আধুনিকতা দ্বিতীয় পর্বে পরিত্যক্ত হয়েছে; ফলে, গল্পস্রোত হয়েছে অনেক বেশী সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ।

আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তের অনন্বয় আর অসঙ্গতি আর হার্দ্য-জটিলতা নিয়ে গল্প লিখেছেন সুব্রত বড়ুয়া। মগ্নচৈতন্যের জটিল বঙ্কিম পথে তিনি উন্মোচন করেন মানব-অস্তিত্বের স্তরীভূত সঙ্কট—অবনীশ বড়ুয়া, মনীষা রায়, আর শুক্লাদির হৃদয়ের যত গোপন যন্ত্রণা। বিষয়াংশ এবং প্রকরণ-পরিচর্যার বিচারে একজন আধুনিক ছোটগাল্পিক হিসেবে

তাঁকে চিনে নেয়া যায় সহেজই। বাক্যগঠনে তিনি পরীক্ষাপ্রিয়, শব্দব্যবহারে সতর্ক। কখনো কখনো চূর্ণ চিত্রকল্প কি অসামান্য কোন উপমা তাঁর গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাকে করে তোলে সংহত সুগভীর।

নগর আর গ্রাম—উভয় প্রাঙ্গণেই গল্পকার সেলিনা হোসেনের অনায়াস যাতায়াত। নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া মানুষের যাপিত জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের ধ্রুপদী জগৎ। জীবনের আহ্বানে, বেঁচে থাকার আকূল বাসনায় তাঁর প্রিয় মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে শহরে। কিন্তু গ্রামের মতো, শহরেও, এরা অপাঙ্‌ক্তেয়, অবশেষে উন্মূলিত, জীবনবিচ্যুৎ, আশারিক্ত। 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯), 'খোল-করতাল' (১৯৮২) প্রভৃতি গ্রন্থে এইসব উন্মূলিত-নিরন্ন-আশাহত মানুষের সাক্ষাৎ পাই আমরা। ইতিহাস-ঐতিহ্যের পটে চরিত্রনির্মাণ সেলিনা হোসেনের অন্যতম ছোটগাল্পিক বৈশিষ্ট্য। মানবপগতির স্বার্থেই তিনি বিচরণ করেন ঐতিহ্যলোকে, কখনো—বা ইতিহাসে, কখনো-বা সংক্ষোভময় সমকালে। সমাজসচেতনতা এবং বস্তুবাদী জীবনপ্রত্যয় নিয়ে তাঁর চরিত্রেরা গল্পের অন্তিমে জেগে ওঠে মানবিক সম্ভাবনায়, সমস্ত নির্বেদ ঝেড়ে-মুছে তারা উত্তীর্ণ হয় জ্যোতির্ময় পরমার্থলোকে। এই ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি বাংলাদেশের সাহিত্যে সেলিনা হোসেনের প্রাতিস্বিকতার কেন্দ্রীয় উৎস। তিনি বিশ্বাস করেন—

> আজকের দিনে তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের শেকড় সন্ধানী অনুপ্রেরণা বৈরী সময়কে অতিক্রম করতে চায়, অতিক্রম করতে চায় মিলিটারি এ্যারিস্টোক্রেসীর বদৌলতে বন্দুকের শাসন। কেননা এই শাসন-উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মূল্যবোধের অবক্ষয়। যে অবক্ষয় সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে ঢুকিয়ে রাখে কালো থাবা। যার নিষ্পেষণে পদদলিত হয় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রমূর্ত রাখার দায়-দায়িত্ব লেখকের।[১৯]

—এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল থেকেই তিনি নির্মাণ করেন তাঁর উপন্যাস, তাঁর ছোটগল্প। বিষয়াংশের মতো প্রকরণ-পরিচর্যায়ও সেলিনা হোসেন পরীক্ষাপ্রিয় ও স্বাতন্ত্র্যঅন্বেষী। গল্পে অপ্রচলিত এবং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে তাঁর নৈপুণ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পের ভাষা গীতল ও চরিত্রানুগ, প্লট সংহত, আর সংলাপ কেন্দ্র-অভিমুখী।

আশির দশকে প্রথম গল্পসঙ্কলন প্রকাশিত হলেও গল্পকার হিসেবে কায়েস আহমেদের আবির্ভাব ষাটের দশকে। 'কালের দায়, কালোত্তীর্ণর দায়, শিল্পের দায় সব কিছুই বস্তুতঃ সমাজেরই দায়, মানুষেরই দায়।'[২০]—এই বিশ্বাসে স্থিত থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন। পুঁজিবাদী

বিশ্বব্যবস্থার বহুমাত্রিক সঙ্কটের পটে মানব-অস্তিত্বের সামগ্রিক রূপ-অঙ্কনই তাঁর ছোটগাল্পিক-অভিযাত্রার মৌল-অন্বিষ্ট। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ''অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব'', ''ফেরারী বসন্তকে খুঁজে'', ''লাশ কাটা ঘর'' প্রভৃতি গল্পের নাম স্মরণীয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নক্সাল-আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা ''মহাকালের ঘোড়া'', ''দুই গায়কের গল্প,'' ''নিয়ামত আলীর জাগরণ'' প্রভৃতি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের কোন গল্পকারই পশ্চিমবঙ্গের নক্সাল-আন্দোলনের ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্য-তাকে এমন সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণে উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। রাঢ়বাংলা ও সমতট অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জীবনপটে বিন্যস্ত হয়েছে তাঁর ছোটগাল্পিক ক্যানভাস। তিনি ছোটগল্পে বেছে নেন সেই সব চরিত্র—শ্রমে-ঘামে, আনন্দে-বিষাদে, সাফল্যে-ব্যর্থতায়, স্বপ্নে-সাধে যাদের জীবন স্পন্দিত-সংক্ষুব্ধ-কল্লোলিত। বিষয়াংশ ও শৈলী-সৌকর্যে কায়েস আহমেদের গল্প সমগ্র বাংলা গল্পের ধারাতেই দাবী করতে পারে স্বতন্ত্র মর্যাদা।

কায়েস আহমেদের ভাষা গদ্য-পদ্যের যুগলবন্দীতে বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলী ও চৈতন্যগ্রন্থির সঙ্গে কায়েস আহমেদের শিল্পরীতির সাধর্ম্য কখনো কখনো আমরা অনুভব করি। তবে জীবন-উপলব্ধিতে মৌলিকভাবেই তিনি শীর্ষেন্দু থেকে দূরবর্তী জগতের বাসিন্দা। পরাবাস্তব আর মগ্নচেতনার প্রভাবে তাঁর গদ্য প্রগত ও প্রাতিস্বিক। যেমন—

> বিকেলের মরে যাওয়া হলদে আলোটা এতোক্ষণ খেলা করছিলো নোটন পায়রার মতো, এক সময় জানলা গলে উড়ে গেছে। অন্ধকার এখন বেড়ালের মতো ঘরের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে।
>
> [অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব]

আলোচ্য পর্বে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্য গ্রামজীবন অতিক্রম করে ক্রমশ শহরমুখী হয়ে উঠেছে। তুলনাসূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ছোটগাল্পিকরা গ্রামীণজীবন চিত্রণে যতটা স্বচ্ছন্দ বস্তুনিষ্ঠ, নগরজীবন চিত্রণে ততটা নন। তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় কথাসাহিত্যের প্রভাবে এ-পর্বে নবীন ছোটগাল্পিকদের রচনায় এসেছে আধুনিক নাগরিকচেতনা, লিবিডোতাড়িত মনোবিকলন এবং যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী অবক্ষয়ীচেতনা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ সংক্ষুব্ধ পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কটও এ-সময়ের ছোটগল্পে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের তুলনায় এ-পর্বের ছোটগাল্পিকরা অনেক বেশি আঙ্গিকসচেতন ও প্রকরণনিষ্ঠ; বিষয়াংশ-নির্বাচন, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-পরিচর্যায় অধিকাংশ ছোটগাল্পিক

পরীক্ষাপ্রবণ ও বৈচিত্র্যসন্ধানী। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালের এই উত্তরাধিকারের ওপরই নির্মিত হয়েছে বিদেশী শত্রুমুক্ত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্য।

৫.

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনে সূচিত হলো মৌল পরিবর্তন, চেতনার ক্ষেত্রেও ঘটলো গুণগত বিকাশ। সমাজজীবনের অন্তর্গঠনের রূপ-পরিবর্তন অভ্যন্তর নিয়মেই রূপান্তরিত করে সমাজের বহির্গঠন তথা চৈতন্যপ্রবাহ। এ-জন্যেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি দেশের স্বাধীনতা সমগ্র জাতিকে রূপান্তরিত সত্তায় করে পুনর্জাত। স্বাধীনতার সোনালি প্রভায় আমাদের মন আর মননে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে, ছোটগল্পে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ছোটগাল্পিক যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শব্দচিত্র অঙ্কনেই হলেন অধিক আগ্রহী; দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর উত্তরণের কথাচিত্র নির্মাণে তাঁরা একান্তই পরাঙ্মুখ। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদে উচ্চকিত হবার পরিবর্তে অনেকেই যেতে চাইলেন নির্বেদ-নিরানন্দের অতল গহ্বরে; এবং সবাই মিলে সম্মিলিত-সাধনায় লিখলেন মাত্র একটি ছোটগল্প, যার মৌল বিষয় নাস্তি— নিখিল নাস্তি। তবে একই সঙ্গে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের বিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর সময়ে সর্বব্যাপী হতাশা, নির্বেদ ও বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পিমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্যে সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি—কোন কোন ছোটগাল্পিকের রচনায় এ-জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধোত্তর ছোটগল্পসাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-সব গল্পকার বাংলাদেশের সাহিত্যে আবির্ভূত হন, তাঁরা হচ্ছেন—কাজী ফজলুর রহমান (১৯৩১-), আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৪-), আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন (১৯৩৪-), মকবুলা মনজুর (১৯৩৮-), আল মাহমুদ (১৯৩৮-), খালেদা এদিব চৌধুরী (১৯৩৯-), নাজমা জেসমীন চৌধুরী (১৯৪০-১৯৮৯), জুবাইদা গুলশান আরা (১৯৪২-), আমজাদ হোসেন (১৯৪২-), আবু কায়সার (১৯৪৫-), হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), শহিদুর রহমান, জুলফিকার মতিন, আরেফিন বাদল, বুলবুল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, আফসান চৌধুরী, তাপস মজুমদার, সৈয়দ ইকবাল, ইমদাদুল

হক মিলন, আতা সরকার, আবু সাঈদ জুবেরী, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, আহমদ বশীর, মুস্তাফা পান্না, সিরাজুল ইসলাম, জাফর তালুকদার, সেলিম রেজা, কাজী শামীম, মঈনুল আহসান সাবের, ইসহাক খান, এহসান চৌধুরী, সাইয়িদ মনোয়ার, ইমরান নূর, সারোয়ার কবীর, রেঁজোয়ান সিদ্দিকী, সুশান্ত মজুমদার, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, হারুন হাবীব, ভাস্কর চৌধুরী, বিপ্লব দাশ, ইসমাইল হোসেন, মহিবুল আজিজ, নকীব ফিরোজ, লুৎফর রহমান রিটন প্রমুখ শিল্পী।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ ও উপাদানপুঞ্জ ব্যবহার করে ছোটগল্প রচনায় বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের মাঝে দেখা দেয় ব্যাপক উৎসাহ। আমাদের গল্পকারদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন জড়িত। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা যুদ্ধোত্তর কালে তাঁদের কাছে বিপুল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দেখা দেয়। দীর্ঘ সিকি শতাব্দী ধরে নিজেকে শনাক্ত করার যে-সাধনায় বাংলাদেশের শিল্পীরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ, তার সাফল্যে ছোটগল্পের ভাব-ভাষা-প্রকরণশৈলীতে যুদ্ধোত্তর কালে এসেছে নতুন মাত্রা। বিষয় ও ভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের ছোটগল্পে যেমন মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে; তেমনি ভাষা-ব্যবহার এবং অলঙ্কার-সৃজনেও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ উপস্থিত। ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। কখনো সরাসরি যুদ্ধকে অবলম্বন করে ছোটগল্প রচিত হয়েছে, কখনো-বা ছোটগল্পের মৌল-ভাব সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে। কোন কোন ছোটগল্পে স্বাধীনতার স্বপক্ষীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং বিপক্ষীয়দের প্রতি ঘৃণাবোধ উচ্চারিত হয়েছে। আবার কোথাও -বা ছোটগল্পের বহিরঙ্গে লেগেছে মুক্তিযুদ্ধের স্পর্শ। মুক্তিযুদ্ধের উপাদানপুঞ্জ ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রায় সব গল্পকারই রচনা করেছেন ছোটগল্প। শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে যাঁদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন— বশীর আল হেলাল (প্রথম কৃষ্ণচূড়া, ১৯৭২), হাসান আজিজুল হক (নামহীন গোত্রহীন, ১৯৭৫), সৈয়দ শামসুল হক (জলেশ্বরীর গল্পগুলো, ১৯৯০), বিপ্রদাস বড়ুয়া (যুদ্ধজয়ের গল্প, ১৯৯১), কাজী ফজলুর রহমান (ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প, ১৯৮৮), সৈয়দ ইকবাল (একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প, ১৯৮৬), এহসান চৌধুরী (একাত্তরের গল্প, ১৯৮৬), শওকত ওসমান (জন্ম যদি তব বঙ্গে, ১৯৭৫), আলাউদ্দিন আল আজাদ (আমার রক্ত, স্বপ্ন আমার, ১৯৭৫), আবু জাফর শামসুদ্দীন (রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, ১৯৭৭), আবুবকর সিদ্দিক (মরে বাঁচার স্বাধীনতা, ১৯৭৭), সাদেকা শফিউল্লাহ (যুদ্ধ অবশেষে, ১৯৮০), খালেদা সালাহউদ্দিন (যখন রুদ্ধশ্বাস, ১৯৮৬) প্রমুখ। এছাড়া

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে যে-সব গল্পের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, লেখকনামসহতারতালিকাটি এ-রকম—সত্যেন সেন (পরিবানুর কাহিনী), তাজুল ইসলাম ফিরোজী (সপ্তর্ষী অনেক দূরে), মঞ্জু সরকার (শান্তি বর্ষিত হোক), শওকত আলী (সোজা রাস্তা, আকাল দর্শন), আফসান চৌধুরী (ফাটা শহরের গল্প), সিরাজুল ইসলাম (দূরের খেলা), রাহাত খান (মধ্যিখানের চর), রশীদ হায়দার (কল্যাণপুর, এ কোন ঠিকানা), মীর নূরুল ইসলাম (স্বৈরিণী ফিরে এসো), কায়েস আহমেদ (আসন্ন), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (অপঘাত), মাহমুদুল হক (কালো মাফলার), মঈনুল আহসান সাবের (কবেজ লেঠেল, ভুল বিকাশ), সুচরিত চৌধুরী (নিঃসঙ্গ নিরাশ্রিত), আবদুল গাফফার চৌধুরী (কেয়া, আমি এবং জারমান মেজর), জহির রায়হান (সময়ের প্রয়োজনে), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (পুঁই ডালিমের কাব্য), আমজাদ হোসেন (উজানে ফেরা), হুমায়ুন আহমেদ (শীত, উনিশ 'শ একাত্তর), রিজিয়া রহমান (ইজ্জত), হুমায়ূন আজাদ (যাদুকরের মৃত্যু), মামুন হুসাইন (মৃত খড় ও বাঙাল একজন) প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ-উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছে এসব গল্প। মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সঙ্কলন-গ্রন্থের কথাও এখানে স্মরণীয়—আবদুল গাফফার চৌধুরী-সম্পাদিত 'বাংলাদেশ কথা কয়' (১৯৭১), আবুল হাসনাত-সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' (১৯৮৩), হারুন হাবীব-সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৫), বিপ্রদাস বড়ুয়া-সম্পাদিত 'মুক্তিযোদ্ধার গল্প' (১৯৯১) প্রভৃতি। এ-সব গ্রন্থে অন্তর্ভূত গল্পসমূহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা ও অনুষঙ্গ শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় হয়েছে উদ্ভাসিত।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প রচিত হলেও, আমরা এখনো পাইনি এমন একগুচ্ছ কালজয়ী গল্প, যা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির সম্মিলিত চৈতন্যের জাগরণকে যথাযথভাবে প্রতিমায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পস্থায়িত্ব এটিকে যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হতে দেয়নি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও হয়নি সর্বব্যাপ্ত এবং এরই শিকার, অধিকাংশ বাঙালির মতো, বাংলাদেশের ছোটগাল্পিকরাও। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অত্যন্ত কাছের একটি ঘটনা, এবং এ-জন্যই অধিকাংশ ছোটগাল্পিকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবেগ-উচ্ছ্বাসতাড়িত, সেখানে স্বভাবতই ফুটে ওঠে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব। সময় পেরিয়ে যখন আসবে নতুন প্রজন্মের ছোটগাল্পিক, হয়ত তাঁদের হাতেই লেখা হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা একগুচ্ছ কালোত্তীর্ণ ছোটগল্প।

স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটা কমেছে, তুলনামূলকভাবে বেড়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। এ-পর্বে অধিকাংশ ছোটগাল্পিক যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন; উৎসাহী হলেন যন্ত্রণাদগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট-জীবনের শিল্পমূর্তি-সৃজনে। সত্তুরের দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্পের মৌল-প্রবণতা ওই দশকেরই একজন প্রধান গল্পকারের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এভাবে—

> সত্তরের গল্পকাররা প্রত্যেকে বয়সে নবীন। কিন্তু সমাজ, মানুষ, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে গল্প রচনায় নবীন নন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ঘটনার প্রতি রয়েছে তাঁদের তীব্র চাউনি। যুদ্ধোত্তর সংকট, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক অভ্যুত্থান এবং শাসকশ্রেণীর প্রতারণার বাস্তবতা সত্তরের গল্পকারদের জীবন্ত বিষয়। লেখকদের মধ্যে যাঁরা সমাজ সজ্ঞান তাঁরা বুর্জোয়া রাজনীতির সীমাবদ্ধতা ও স্খলন ছোটগল্পে চিত্রিত করেন। সত্তরের রোমান্টিকধারার গল্প লেখকরাও সামাজিক অসাম্য অস্থিরতা চিত্রিত করেছেন তাঁদের গল্পে।...এই দশকের গল্পলেখকদের গল্প-পাঠে দেখা যায়, তাঁরা যে যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তার সব কিছু আত্মস্যাৎ করেছেন ছোটগল্পে। গ্রাম ও শহর উভয়বিধ পটভূমি উঠে এসেছে ছোটগল্পের জমিতে।[২১]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের ছোটগল্পে যে-সব শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে বুলবুল চৌধুরী, আল মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দিক, আতা সরকার, আহমদ বশীর, মঞ্জু সরকার, সৈয়দ ইকবাল, হরিপদ দত্ত, সুশান্ত মজুমদার, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মুস্তাফা পান্না, মঈনুল আহসান সাবের প্রমুখ শিল্পী যথার্থ অর্থেই রেখেছেন প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর।

সাবলীল গদ্যে মানুষ ও সমাজের তলদেশ উদ্ভাসনে বুলবুল চৌধুরীর নৈপুণ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানুষের আদিম জৈবকামনার নিরাভরণ চিত্র প্রতীকী ব্যঞ্জনা এবং আবেগী পরিচর্যায় অঙ্কিত হয়েছে আল মাহমুদের ছোটগল্পে। ''পানকৌড়ির রক্ত'' কিংবা ''জলবেশ্যা''-র মতো দুঃসাহসী গল্পে কাম-বাসনার পটে মানব-মনস্তত্ত্বের জটিলতা উন্মোচনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আল মাহমুদ।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের যুগসঙ্কট এবং রাজনৈতিক সংক্ষোভ-সংগ্রাম নিয়ে গল্প লিখেছেন আবুবকর সিদ্দিক। বিষয় ও প্রকরণে তাঁর গল্প বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যপ্রত্যাশী। রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নিয়ে গল্প-রচনায় সৈয়দ

ইকবালও সমধিক উৎসাহী। স্বাধীনতা-উত্তরকালের বিপন্নতা ও নির্বেদ নিয়ে বেশ কিছু নিরীক্ষাসফল গল্প লিখেছেন তিনি। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সুশান্ত মজুমদারের গল্পেও আছে এই নিরীক্ষার স্বাক্ষর। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে জীবন ও প্রকৃতিব মনোময় একাত্মতা বাংলাদেশের ছোটগল্পে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ''ভগবান'', ''জটাধারীর বান্নী'', ''উজানিভাটালি'' প্রভৃতি গল্প বিশেষভাবে স্মরণীয়। রাজনৈতিক কূট-তর্ক, তত্ত্বসঙ্কট এবং সামরিক শাসনের পটে গল্প লিখেছেন আতা সরকার। সত্তুর দশকের রাজনীতি যেন বন্দী হয়ে আছে আতা সরকারের গল্পে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো আহমদ বশীরও ঢাকার জনজীবন নিয়ে গল্প লিখে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্জু সরকারের গল্পে রূপান্বিত হয়েছে উত্তরবাংলার রুক্ষ প্রকৃতি, বিধ্বস্ত জনপদ, বিপন্ন সমাজ আর সংগ্রামী জনগোষ্ঠী। রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও ফুটে আছে মঞ্জু সরকারের গল্পে।

শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে শোষকের পতন আর শোষিতের উত্থান নিয়ে গল্প লিখেছেন হরিপদ দত্ত। খেটে-খাওয়া নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী চেতনাই তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। চড়া সুরে বাঁধা হরিপদ দত্তের গল্প। চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে হরিপদ দত্তের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুস্তাফা পান্নার গল্পেও আছে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে শৈল্পিক সিদ্ধির স্বাক্ষর। দক্ষিণবাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আর তাদের সংগ্রামশীল জীবনই মুস্তাফা পান্নার গল্পের মৌল বিষয়। হরিপদ দত্তের মতো মুস্তাফা পান্নার গল্পের অন্তর্স্রোতেও সর্বদা বহমান শ্রেণীচেতনা। মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্য-উন্মোচনই মঈনুল আহসান সাহেবের ছোটগল্পের মৌল অন্বিষ্ট। শহরজীবনের ক্লেদ-স্খলন-নির্বেদ নিয়ে গল্প-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বোধ করি এই যে, এ-সময় আমাদের ছোটগাল্পিক-চেতনা হয়ে ওঠে অনেক বেশী রাজনীতিসচেতন ও জনজীবনমূল-অন্বেষী। 'সত্তর দশকের সমস্ত গল্প লেখকদের গল্পের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্বলিত কথাবস্তু।'[২২] বস্তুত, আশির দশকের গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাঠকপ্রিয়তার লোভে এবং বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনায় কয়েকজন শক্তিমান গল্পকার সৃষ্টি করেছেন একটা 'জলো, অসার, বারোয়ারি কেচ্ছা' লেখার ধারা, যা ক্রমশ স্ফীতোদর হচ্ছে, ধ্বংস করছে গল্পসাহিত্যের শিল্পিত বিকাশের

যাত্রাপথ। ষাটের দশকে যে আঙ্গিক-সচেতনতার সূত্রপাত, আশিতে এসে তা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন অনেকেই পাঠকরুচির কাছে বিসর্জন দিচ্ছেন শিল্পমানকে, সরস বক্তব্যভুক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যেই তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট।

৬.

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের ছোটগল্পের বিকাশরেখা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিস্তৃতির অবকাশ না-থাকার কারণে, অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনাকে করতে হয়েছে সংক্ষিপ্ত, এবং এ-কারণেই অনেক অপ্রধান ছোটগাল্পিকের রচনা হতে পারেনি আলোচনার অন্তর্গত। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে-সত্য প্রতিষ্ঠা পায়, তা এই যে, আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্প দাবি করতে পারে গৌরবের আসন। তবে বর্তমান সময়ে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে চলছে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব। বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় বঙ্গ—উভয় ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ছোটগাল্পিকের আবির্ভাব এখন ক্বচিৎ-কদাচিৎ। ইতঃপূর্বে যাঁরা ভালো গল্প লিখেছেন, তাঁরা অনেকেই, হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, আসছে না নবীন কোন ছোটগাল্পিক। প্রবীণরা, অনেকেই, পূর্বে-লেখা গল্পগুলো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন ভাষ্যে করছেন উপস্থাপন। বোঝা যায়, ফুরিয়ে গেছে তাঁদের প্রতিভার দীপ্তি।

পঞ্চাশ-ষাট-সত্তুরের দশকে ছোটগল্পের মূল বাহন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর অভাব ছিল প্রকট। তবু ছোটগল্প রচিত হয়েছে। বর্তমানে পত্র-পত্রিকার অভাব নেই, অভাব ভালো ছোটগল্পের। মানুষের সময়ধারণার পটভূমিতে জন্ম হয়েছিল ছোটগল্পের। সময়ের শাসন এখন ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আরো প্রকট। তাহলে বাংলা ছোটগল্পের এই দৈন্যদশা কেন? নাকি পাঠকপ্রিয়তা ও বাণিজ্যবুদ্ধির প্রেরণায় রচিত ষাট থেকে আশি পৃষ্ঠার উপন্যাস নামের বড় গল্পগুলো বাধাগ্রস্ত করছে ছোটগল্পের বিকাশ? পাঠক-রুচির কাছে লেখক বিসর্জন দিচ্ছেন কি আপন প্রতিভা? প্রকাশক যেঁ কাটতি না থাকলে ছোটগল্পের বই প্রকাশ করবেন না—একথা তো বলাইবাহুল্য। তবু তো কথা থেকে যায় কোন কোন সৎ প্রকাশকের কাছে। আমরা আশা করবো, সেইসব নবীন-প্রবীণ ছোটগাল্পিক, যাঁদের ক্ষমতা আছে, তাঁরা এগিয়ে আসবেন ভালো

ছোটগল্প রচনায়; সম্মিলিত সাধনায় তাঁরা আবার আনবেন বাংলাদেশের ছোটগল্পের পঞ্চাশ-ষাট-সত্তুরের সেই স্বর্ণালি আভা, একবার, আরও একবার।

তথ্যনির্দেশ

১. রথীন্দ্রনাথ রায় : *ছোটগল্পের কথা* (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ. ৪৬

২. সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ. ১৪

৩. রাজীব হুমায়ুন : *আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ রচনা* (ঢাকা, ১৯৮৫) পৃ. ১২-১৯

৪. সৈয়দ আকরম হোসেন : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ৭৫, ৭৭

৫. আহমদ কবির : ''স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ : প্রসঙ্গ—ছোটগল্প'', *একুশের প্রবন্ধ ৮৮* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ৩৮

৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), (ঢাকা, ১৩৮৫), পৃ. ৪৪০

৭. অসীম সাহা : ''এ-দেশের গল্প/পূর্ণতা-অপূর্ণতা'', *'কণ্ঠস্বর'* (সম্পাদক : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ), ঢাকা, দশম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২৭

৮. রফিকউল্লাহ খান: ''হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্প'', *সাহিত্য পত্রিকা*, (সম্পাদক-মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), অষ্টাবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯১, পৃ. ২৪১

৯. অসীম সাহা : ''এ দেশের গল্প/পূর্ণতা-অপূর্ণতা'', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২

১১. আহমদ কবির : ''স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ : প্রসঙ্গ— ছোটগল্প'', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৯২), পৃ. ১৪-১৫

১৩. আহমদ কবির : ''স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ—ছোটগল্প'', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৪. অসীম সাহা : ''এ-দেশের গল্প/পূর্ণতা-অপূর্ণতা'', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

১৫. অশ্রুকুমার সিকদার : *নবীন যদুর বংশ* (কলকাতা, ১৯৯১), পৃ. ১৪৭

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭-৪৮

১৭. আবু জাফর : *গল্পকার হাসান আজিজুল হক* (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ১০

১৮. সুশান্ত মজুমদার : ''আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর'', *আজকে কাগজ*, ঢাকা, ১৫.০৮.১৯৯১

১৯. সালাম সালেহ্উদ্দীন (সম্পাদক) : *অরুন্ধতী*, প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, জুলা ১৯৯১, ঢাকা, পৃ. ৩৫

২০. কায়েস আহমেদ : ''নিজের সঙ্গে আলাপ'', *অরুন্ধতী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

২১. সুশান্ত মজুমদার : ''ষাটের উত্তরাধিকার : সত্তরের গল্প'', *অরুন্ধতী*, পূর্বোক্ত পৃ. ২৯

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮